فِي عَهْدِي وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي.

کرونگا اور جوان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اُسکی کوئی ذمہ داری نہیں.

(کذا فی الدر المنثور بروایت ابی داؤد وابن ماجۃ وفیہ ایضًا اخرج مالک و ابن ابی شیبۃ واحمد وابوداؤد والنسائی وابن ماجۃ وابن حبان والبیہقی عن عبادۃ بن الصامت فذکر معنی حدیث الباب مرفوعًا باطول منہ)

(৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন, আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মত গুরুত্ব সহকারে আদায় করিবে আমি তাহাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি গুরুত্ব সহকারে এই নামাযসমূহ আদায় করিবে না, তাহার ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (দুররে মানসূর ঃ আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ অন্য এক হাদীসে বিষয়টি আরও পরিস্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অবহেলাবশতঃ এই নামাযে কোন প্রকার ত্রুটি না করে ; বরং উত্তমরূপে ওযূ করিয়া সময় মত খুশু ও খুযুর সহিত নামায পড়ে, আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। আর যেই ব্যক্তি এইরূপ করিবে না, তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালার কোন ওয়াদা নাই—তাহাকে ক্ষমা করা বা শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। নামাযের কত বড় ফযীলত যে, ইহার এহতেমাম করিলে বান্দা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা ও জিম্মাদারীর মধ্যে দাখেল হইয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই যে, যদি কোন সাধারণ সরকারী লোক কিংবা কোন ধনী ব্যক্তি কাহাকেও কোন প্রকার আশ্বাস দেয় অথবা কোন দাবী পূরণের জিম্মাদারী নেয় কিংবা কোন বিষয়ে জামিন হয়, তবে সেই ব্যক্তি কত নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হয় এবং সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ ও ভক্ত হইয়া যায়। অথচ এইখানে মামুলী একটি এবাদত যাহাতে তেমন কোন কষ্টও নাই উপরন্তু সকল বাদশাহের বাদশাহ ওয়াদা করিতেছেন। এতদসত্ত্বেও ইহার প্রতি আমরা উদাসীন ও গাফেল। ইহাতে কাহার কি ক্ষতি ; নিজেরই দুর্ভাগ্য এবং নিজেরই ক্ষতি।

(١٠) عَنِ ابْنِ سَلْمَانَ اَنَّ رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ اَخْرَجُوْا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْوَادِيْ قَالَ وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ قَالَ مَا زِلْتُ اَبِيْعُ وَاَبْتَاعُ حَتّٰى رَبِحْتُ ثَلٰثَمِائَةِ اُوْقِيَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ قَالَ مَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ.

(اخرجہ ابوداؤد وسکت عنہ المنذری)

ایک صحابی رضؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مالِ غنیمت کو نکالا جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے اور خرید وفروخت شروع ہوگئی (کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا) اتنے میں ایک صحابی حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا۔ حضورؐ نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا انہوں نے عرض کیا کہ حضورؐ میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں تین سو اُوقیہ چاندی نفع میں بچی حضورؐ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں انہوں نے عرض کیا حضور ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دو رکعت نفل۔

(১০) একজন সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, আমরা যখন যুদ্ধে খায়বর জয় করিলাম, তখন লোকেরা তাহাদের গনীমতের মাল বাহির করিল। যাহার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সামান–পত্র এবং যুদ্ধবন্দী ছিল। অতঃপর বেচা–কেনা শুরু হইয়া গেল। (অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজের অপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করিতে লাগিল) এমন সময় একজন সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজকের এই ব্যবসায় আমার এত বেশী লাভ হইয়াছে যে, সমস্ত জামাতের মধ্যে আর কাহারও এই পরিমাণ লাভ হয় নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পরিমাণ লাভ করিয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সামান খরিদ করিতেছিলাম এবং তাহা বিক্রয় করিতেছিলাম। ইহাতে আমার তিনশত উকিয়া লাভ হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি

তোমাকে সবচাইতে লাভ জনক জিনিস কি উহা বলিয়া দিবো? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ফরজ নামাযের পর দুই রাকআত নফল। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ চল্লিশ দেরহামে এক উকিয়া হয় এবং প্রায় চার আনাতে এক দেরহাম হয়। সুতরাং এই হিসাব অনুযায়ী তিন হাজার রুপী হইয়াছে। ইহার মোকাবেলায় দোজাহানের বাদশাহের এরশাদ হইল, ইহা আর তেমন কি লাভ! প্রকৃত লাভ হইল যাহা চিরকাল বাকি থাকিবে; কোন দিন শেষ হইবে না। বাস্তবিকই যদি আমাদের ঈমান এইরূপ হইয়া যাইত এবং দুই রাকআত নামাযের তুলনায় তিন হাজার টাকা আমাদের নিকট কোনই মূল্য না রাখিত, তবেই আমরা জীবনের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করিতে পারিতাম। আসলে নামায এমনই এক মূল্যবান সম্পদ। এই জন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চোখের শীতলতা ও তৃপ্তি নামাযের মধ্যে বলিয়া এরশাদ করিয়াছেন এবং ওফাতের সময় সর্বশেষ ওসিয়ত যাহা করিয়াছেন উহাতে নামাযের এহতেমামের হুকুম করিয়াছেন। (কানযুল উম্মাল)

বিভিন্ন হাদীসে উহার ওসিয়ত উল্লেখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, জীবনের অন্তিম সময়ে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক হইতে ঠিকভাবে শব্দও উচ্চারিত হইতেছিল না; তখনও তিনি নামায ও গোলামের হক সম্বন্ধে তাকীদ করিয়াছিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) হইতেও নকল করা হইয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সর্বশেষ কথা ছিল নামাযের তাকীদ এবং গোলামের হক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার হুকুম। (জামে ছগীর)

একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজ্‌দ অভিমুখে জেহাদের উদ্দেশ্যে একটি জামাত পাঠাইলেন। তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ গণীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহা দেখিয়া লোকেরা বড় আশ্চর্য হইল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় কামিয়াবী এবং এত মাল-সম্পদ লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে ইহা হইতেও কম সময়ে ও এই মাল ও গনীমত অপেক্ষা অধিক মাল ও গনীমত উপার্জনকারী জামাতের কথা বলিয়া দিব? তাহারা ঐ সকল লোক, যাহারা ফজরের নামায জামাআতে আদায় করে অতঃপর সূর্য উঠা

পর্যন্ত সেখানেই বসিয়া থাকে। সূর্য উঠিবার পর (যখন মাকরূহ সময় অর্থাৎ প্রায় বিশ মিনিট অতিবাহিত হইয়া যায় তখন) দুই রাকআত (ইশরাকের) নামায পড়ে। ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশী ধন-সম্পদ উপার্জনকারী।

বিখ্যাত বুযুর্গ সূফী হযরত শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন যে, আমি পাঁচটি জিনিস তালাশ করিয়াছি এবং তাহা পাঁচ জায়গায় পাইয়াছি। (১) রুজীর বরকত চাশ্‌তের নামাযে। (২) কবরের জ্যোতি তাহাজ্জুদ নামাযে। (৩) মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জওয়াব কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে। (৪) সহজে পুলছেরাত পার হওয়া রোযা ও ছদকার মধ্যে। (৫) আরশের ছায়া নির্জনতার মধ্যে। (নুযহাতুল-মাজালিস)

হাদীসের কিতাবসমূহে নামায সম্পর্কে বহু তাকীদ এবং নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এই সবগুলিকে একত্রিত করিয়া বর্ণনা করা দুরূহ ব্যাপার। তবুও বরকতের জন্য কিছুসংখ্যক হাদীসের শুধু তরজমা পেশ করা হইল।

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের উপর সর্বপ্রথম নামায ফরজ করিয়াছেন এবং কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হইবে।

(২) নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।

(৩) মানুষ ও শির্‌কের মধ্যে একমাত্র নামাযই হইল বাধা ও অন্তরায়।

(৪) ইসলামের আলামত হইল নামায। যে ব্যক্তি দিলকে ফারেগ করিয়া সঠিক সময় ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামায পড়িবে সে প্রকৃত মু'মিন।

(৫) আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও নামাযের চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস ফরজ করেন নাই। যদি উহা হইতে উত্তম আর কোন জিনিস ফরজ করিতেন, তবে ফেরেশতাগণকে সেই কাজ করিবার জন্য হুকুম করিতেন। ফেরেশতাগণ দিবা-রাত্রি কেহ রুকুতে আর কেহ সেজদায় আছেন।

(৬) নামায দ্বীনের খুঁটি।

(৭) নামায শয়তানের মুখ কালো করিয়া দেয়।

(৮) নামায মুমিনের নূর।

(৯) নামায শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

(১০) যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে পুরাপুরি মনোযোগ দেন। যখন সে নামায হইতে মনোযোগ সরাইয়া

নেয়, তখন আল্লাহ তায়ালাও মনোযোগ সরাইয়া নেন।

(১১) যখন কোন আসমানী বালা নাযিল হয়, তখন তাহা মসজিদ আবাদকারীদের হইতে সরিয়া যায়।

(১২) কোন কারণে যদি মানুষ জাহান্নামে যায়, তবে তাহার সেজদার জায়গাকে আগুন স্পর্শ করিবে না।

(১৩) আল্লাহ তায়ালা সেজদার জায়গাগুলিকে জাহান্নামের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন।

(১৪) সব চাইতে পছন্দনীয় আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট ঐ নামায যাহা সময় মত আদায় করা হয়।

(১৫) আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাহার সকল অবস্থার মধ্যে এই অবস্থায় দেখিতে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন যে, মানুষ সেজদায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং কপাল মাটিতে ঘষিতেছে।

(১৬) সেজদার অবস্থায় মানুষ আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশী নৈকট্য লাভ করে।

(১৭) নামায বেহেশতের চাবি।

(১৮) মানুষ যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলিয়া যায় এবং আল্লাহ তায়ালা ও নামাযী ব্যক্তির মধ্য হইতে পর্দাসমূহ সরিয়া যায় যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাশি ইত্যাদির মধ্যে মশগুল না হয়।

(১৯) নামাযী ব্যক্তি শাহানশাহের দরজায় খটখটাইতে থাকে, আর স্বাভাবিক নিয়ম হইল, দরজা খটখটাইতে থাকিলে তাহা খুলিয়াই যায়।

(২০) দ্বীনের মধ্যে নামাযের মর্যাদা এমন, যেমন শরীরের মধ্যে মাথার মর্যাদা।

(২১) নামায দিলের নূর, যে ব্যক্তি নিজের দিলকে নূরানী বানাইতে চায় সে যেন নামাযের দ্বারা বানাইয়া লয়।

(২২) যে ব্যক্তি ভাল করিয়া ওযূ করে অতঃপর খুশু–খুযূ সহকারে দুই রাকআত অথবা চার রাকআত ফরজ কিংবা নফল নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজের গোনাহসমূহের জন্য মাফ চায় আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দেন।

(২৩) জমিনের যে অংশের উপর নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালাকে ইয়াদ করা হয় সেই অংশটি জমিনের অন্যান্য অংশের উপর গর্ব করে।

(২৪) যে ব্যক্তি দুই রাকআত নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন দোয়া করে, সঙ্গে সঙ্গে হউক বা কোন কারণে দেরীতে হউক আল্লাহ তায়ালা সেই দোয়া অবশ্যই কবূল করিয়া নেন।

(২৫) যে ব্যক্তি নির্জনে দুই রাকআত নামায আদায় করে, যাহা আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ ব্যতীত আর কেহ জানিতে না পারে, সেই ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তির পরওয়ানা পাইয়া যায়।

(২৬) যে ব্যক্তি একটি ফরজ নামায আদায় করে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাহার একটি দোয়া কবূল হইয়া যায়।

(২৭) যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায এহতেমামের সহিত আদায় করিতে থাকে, রুকু সেজদা ওযূ ইত্যাদি এহতেমামের সহিত উত্তমরূপে পুরাপুরিভাবে আদায় করিতে থাকে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায় এবং দোযখ তাহার জন্য হারাম হইয়া যায়।

(২৮) মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের এহতেমাম করিতে থাকে, শয়তান তাহাকে ভয় করিতে থাকে। আর যখন সে নামাযে গাফলতি করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার উপর শয়তান সাহস পাইয়া যায় এবং তাহাকে বিপথগামী করার লোভ করিতে থাকে।

(২৯) সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল হইল আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া।

(৩০) নামায প্রত্যেক পরহেজগার ব্যক্তির কুরবানীস্বরূপ।

(৩১) আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হইল আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া।

(৩২) যে সকালবেলায় নামায পড়িতে যায়, তাহার হাতে ঈমানের ঝাণ্ডা থাকে। আর যে বাজারে যায় তাহার হাতে শয়তানের ঝাণ্ডা থাকে।

(৩৩) যোহরের নামাযের আগে চারি রাকআত নামাযের সওয়াব এমন যেমন তাহাজ্জুদের চারি রাকআত নামাযের সওয়াব।

(৩৪) যোহরের পূর্বে চারি রাকআত নামায তাহাজ্জুদের চারি রাকআতের সমান বলিয়া গণ্য হয়।

(৩৫) মানুষ যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন আল্লাহর রহমত তাহার দিকে মনোযোগী হয়।

(৩৬) শ্রেষ্ঠতর নামায হইল মধ্যরাত্রির নামায, কিন্তু এই নামায আদায়কারীর সংখ্যা অনেক কম।

(৩৭) আমার নিকট হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি যতদিনই বাঁচিয়া থাকুন না কেন একদিন আপনাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে, আর যাহাকে ইচ্ছা ভালবাসুন না কেন একদিন আপনাকে তাহার নিকট হইতে পৃথক হইতে হইবে, আর ভাল–মন্দ যে আমলই আপনি করুন না কেন উহার বদলা অবশ্যই পাইবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ

নাই যে,মুমিনের শরাফত ও বুযুর্গী তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্যে এবং মুমিনের ইজ্জত ও সম্মান অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

(৩৮) শেষ রাত্রের দুই রাকআত নামায সমস্ত দুনিয়া হইতে শ্রেষ্ঠ। কষ্টের আশংকা না হইলে আমি ইহা উম্মতের উপর ফরজ করিয়া দিতাম।

(৩৯) তাহাজ্জুদ নামায অবশ্যই পড়। কেননা, ইহা নেক বান্দাদের তরীকা এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উপায়। তাহাজ্জুদ গোনাহ হইতে বিরত রাখে এবং গোনাহ মাফ হওয়ার উপায়। ইহাতে শারীরিক সুস্থতাও লাভ হয়।

(৪০) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন, হে আদমসন্তান! দিনের শুরুতে তুমি চারি রাকআত নামায আদায়ে অক্ষম হইও না। আমি সারাদিন তোমার যাবতীয় কাজ সমাধা করিয়া দিব।

হাদীসের কিতাবসমূহে নামাযের ফযীলত ও নামাযের প্রতি উৎসাহদান প্রসঙ্গে বহু হাদীসের উল্লেখ রহিয়াছে। চল্লিশের সংখ্যা পূরণের উদ্দেশ্যে এই হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হইল। যাহাতে চল্লিশ হাদীসের বিশেষ ফযীলত হাসিল করিবার জন্য কেহ এইগুলি মুখস্থ করিয়া লইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে নামায এমনই এক বিরাট সম্পদ যে, ইহার মর্যাদা একমাত্র সেই ব্যক্তিই রক্ষা করিতে পারে যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এই নামাযের স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন। নামাযের এহেন মর্যাদার কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে আপন চোখের শীতলতা বলিয়াছেন আর এই স্বাদের দরুনই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের অধিকাংশ সময় নামাযের মধ্যে অতিবাহিত করিয়া দিতেন। আর এই কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় বিশেষভাবে নামাযের জন্য ওসিয়ত করিয়াছেন এবং এহতেমামের সহিত উহা আদায় করিবার জন্য তাকীদ করিয়াছেন।

বিভিন্ন হাদীস শরীফে নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে ঃ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ, নামাযের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন যে, সমস্ত আমলের মধ্যে আমার নিকট নামাযই সবচেয়ে প্রিয় আমল।

এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, এক রাত্রে আমি মসজিদে নববীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম ; হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেছিলেন। আমি আগ্রহের সহিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পিছনে নামাযের নিয়ত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে বাকারা তেলাওয়াত করিতেছিলেন। আমি মনে করিলাম যে, তিনি একশত আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়া রুকূ করিবেন। কিন্তু যখন তিনি একশত আয়াত পাঠ করিয়া রুকু করিলেন না তখন আমি মনে করিলাম, দুইশত আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়া রুকূ করিবেন। কিন্তু সেখানেও তিনি রুকূ করিলেন না। তখন আমি মনে করিলাম, সূরা শেষ করিয়া রুকূ করিবেন। কিন্তু যখন সূরা শেষ হইল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকবার 'আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদ' পড়িলেন অতঃপর সূরা আলি-ইমরান শুরু করিয়া দিলেন। ইহাতে আমি চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। অবশেষে মনে করিলাম যে, সূরায়ে আলি-ইমরান শেষ করিয়া তো অবশ্যই রুকূ করিবেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাও শেষ করিলেন এবং তিনবার 'আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদ' পড়িয়া সূরায়ে মায়েদা শুরু করিয়া দিলেন। অতঃপর এই সূরা শেষ করিয়া রুকূ করিলেন। রুকূর মধ্যে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' পড়িতে থাকিলেন এবং ইহার সঙ্গে আরও কিছু পড়িতেছিলেন যাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। অতঃপর সেজদায় যাইয়াও পূর্বের মত 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়িতেছিলেন এবং ইহার সঙ্গে আরও কিছু পড়িতেছিলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে আনআম শুরু করিয়া দিলেন। আমি আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়িবার হিম্মত করিতে পারিলাম না। অবশেষে বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিলাম। প্রথম রাকআতে প্রায় পাঁচ পারা হইয়াছে। তদুপরি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পড়াও একেবারে ধীরে ধীরে তাজবীদ ও তারতীলের সহিত—প্রত্যেক আয়াতকে তিনি পৃথক পৃথক করিয়া তেলাওয়াত করিতে অভ্যস্থ ছিলেন। এমতাবস্থায় নামাযের রাকআত কতই না লম্বা হইয়াছিল! এইসব কারণেই নামায পড়িতে পড়িতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা মোবারক ফুলিয়া যাইত! কিন্তু যে জিনিসের স্বাদ একবার অন্তরে স্থান করিয়া লয় উহাতে কষ্ট ও পরিশ্রম করা কঠিন মনে হয় না।

আবূ ইসহাক সুবাইহী (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। একশত বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। তিনি আফসোস করিতেন, হায়! বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে এখন আর নামাযের স্বাদ পাই না ; দুই রাকআতে শুধুমাত্র সূরায়ে বাকারা ও সূরায়ে আলি-ইমরান এই দুইটি

সূরা-ই পড়িতে পারি—ইহার বেশী পড়িতে পারি না। উল্লেখ্য যে, এই দুইটি সূরা পৌনে চার পারার সমান।

মুহাম্মদ ইবনে সিমাক (রহঃ) বলেন, কুফা নগরে আমার একজন প্রতিবেশী ছিল। তাহার একটি ছেলে দিনের বেলায় সব সময় রোযা রাখিত এবং রাতভর নামায পড়িত ও ভাবপূর্ণ কবিতা পাঠে মশগুল থাকিত। ছেলেটি শুকাইয়া এমন হইয়া গিয়াছিল যে, শরীরে হাড্ডি ও চামড়াটুকুই বাকী ছিল। তাহার পিতা একদিন আমাকে ছেলেটিকে বুঝাইতে বলিলেন। অতঃপর আমি একদিন আমার বাড়ীর দরজায় বসিয়া ছিলাম ; সে আমার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিলে আমি তাহাকে ডাকিলাম। সে আসিল এবং সালাম দিয়া আমার নিকট বসিল। আমি আমার কথা আরম্ভ করিতেই সে বলিতে লাগিল, চাচা! আপনি হয়তো আমাকে পরিশ্রম কম করিবার পরামর্শ দিবেন। চাচাজান! আমি এই মহল্লার কয়েকজন ছেলের সহিত এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, দেখা যাক আমাদের মধ্যে কে বেশী এবাদত করিতে পারে। তাহারা চেষ্টা ও মেহনত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ডাকিয়া লওয়া হইয়াছে। যখন তাহাদের ডাক আসিল, তাহারা অতি আনন্দের সহিত চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে আমি ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট নাই। আমার আমল প্রতিদিন দুইবার তাহাদের সামনে প্রকাশ হইয়া থাকিবে, কাজেই উহাতে কম হইলে তাহারা কি মনে করিবে! চাচাজান! ঐ সকল যুবকরা বড় সাধনা করিয়াছে। এই বলিয়া সে তাহাদের মেহনত-মুজাহাদার বিবরণ দিতে লাগিল। বিবরণ শুনিয়া আমরা হতভম্ভ হইয়া গেলাম। অতঃপর সেই ছেলে উঠিয়া চলিয়া গেল। তৃতীয় দিন আমরা শুনিলাম যে, এই ছেলেটিও দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছে। আল্লাহ তাহার উপর অফুরন্ত রহমত নাযিল করুন। বর্তমান অধঃপতনের যুগেও আল্লাহর এমন সব বান্দা দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা রাত্রের অধিকাংশ সময়ই নামাযের মধ্যে কাটাইয়া দেন এবং দিনের বেলায় দ্বীনের অন্যান্য কাজ তালীম তবলীগ ইত্যাদির মধ্যে মনোনিবেশ করেন।

হযরত মুজাদ্দেদে আল্‌ফে সানী (রহঃ)এর নাম শুনে নাই হিন্দুস্থানে এমন কে আছে—তাঁহারই একজন বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ লাহোরী (রহঃ) একদিন বলিয়া উঠিলেন, বেহেশতে কি নামায হইবে না? কেহ উত্তর করিল, বেহেশতে নামায কেন হইবে, উহা তো আমলের বদলা দেওয়ার স্থান, আমল করার স্থান নয়। ইহা শুনিয়া তিনি আ-হ্ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হায় আফসোস! নামায

ছাড়া বেহেশতে কিভাবে সময় কাটিবে। বস্তুতঃ এইসব লোকের ওসীলাতেই দুনিয়া কায়েম রহিয়াছে এবং তাঁহারাই সার্থক জীবন লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ পাক তাঁহার মাহবুব বান্দাদের ওসীলায় এই অধমের প্রতিও যদি কিছুটা রহমতের দৃষ্টি করেন, তবে তাঁহার সীমাহীন রহমতের কাছে অসম্ভব কিছুই নয়।

এখানে একটি সুন্দর ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিতেছি। হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) মুনাব্বেহাত কিতাবে লিখিয়াছেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন ঃ এই দুনিয়াতে তিনটি জিনিস আমার প্রিয়—খুশবু, নারী আর নামাযে আমার চোখের শীতলতা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তখন কয়েকজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়—আপনার চেহারা মুবারক দেখা, আমার অর্থ-সম্পদ আপনার জন্য খরচ করা এবং আমার কন্যা আপনার বিবাহে রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়—সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ এবং পুরাতন কাপড় পরিধান করা।

হযরত উসমান (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন। আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়—ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা এবং কুরআন পাকের তেলাওয়াত।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমারও তিনটি জিনিস প্রিয়—মেহমানের খেদমত, গরমের দিনে রোযা রাখা এবং দুশমনের উপর তলোয়ার চালানো।

এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তশরীফ আনিলেন এবং আরজ করিলেন, আমাকে আল্লাহ তায়ালা পাঠাইয়াছেন। অতঃপর বলিলেন যে, আমি (জিবরাঈল) যদি দুনিয়াবাসীদের একজন হইতাম তবে কি পছন্দ করিতাম, বলিব কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বলুন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, পথহারাদের পথের সন্ধান দেওয়া, গরীব এবাদতকারী লোকদেরকে মহব্বত করা এবং সন্তান-সন্ততিওয়ালা গরীব লোকদেরকে সাহায্য করা। আর আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন—জান-মালের শক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা, গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ক্রন্দন করা এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছবর করা।

হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) 'যাদুল–মাআদ' কিতাবে লিখিয়াছেন, নামায রুজী আকর্ষণ করে, স্বাস্থ্য রক্ষা করে, রোগ–ব্যাধি দূর করে, অন্তরকে শক্তিশালী করে, চেহারার নূর ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, মনে আনন্দ দেয়, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গে সজীবতা আনে, অলসতা দূর করে, অন্তর খুলিয়া দেয়। নামায রূহের খোরাক, দিলকে নূরানী করে, আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতকে রক্ষা করে, আল্লাহর আজাব হইতে বাঁচাইয়া রাখে, শয়তানকে দূর করিয়া রাখে, রহমানের সহিত নৈকট্য সৃষ্টি করে। মোটকথা দেহ এবং আত্মার সুস্থতা রক্ষার জন্য নামাযের বিশেষ দখল ও আশ্চর্যজনক তাছীর রহিয়াছে। ইহা ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় ক্ষতি ও অনিষ্ট দূরীকরণ ও দোজাহানের যাবতীয় কল্যাণ সাধনে নামাযের বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামায না পড়ার ভয়াবহ পরিণতি
এই সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বিবরণ

হাদীসের কিতাবসমূহে নামায না পড়ার উপর কঠিন কঠিন আজাব ও শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে। সত্য সংবাদদাতা হযরত নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসই বুদ্ধিমান ও বিবেকসম্পন্ন লোকের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু উম্মতের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও মহব্বতের উপর কুরবান হইয়া যাওয়া উচিত যে, তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য বিভিন্নভাবে বারবার আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহার নামের ধারক বাহক উম্মত যেন নামাযের ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি না করে। কিন্তু আফসোস আমাদের অবস্থার উপর যে, হুযূরের এই পরিমাণ এহতেমাম সত্ত্বেও আমরা নামাযের প্রতি কোন গুরুত্বই দেই না। আবার নিজেদেরকে নির্লজ্জভাবে হুযূরের উম্মত ও তাহার অনুসারী এবং ইসলামের একমাত্র স্বত্বাধিকারী মনে করিয়া থাকি।

(১) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ۔ رواه احمد ومسلم

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔

وَقَالَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ۔

(ابوداؤد والنسائی ولفظه ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلوة والترمذی ولفظه قال بين الكفر والايمان ترك الصلوة وابن ماجة ولفظه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلوة كذا فی الترغيب للمنذری وقال السيوطی فی الدر الحديث جابر اخرجه ابن ابی شيبة واحمد ومسلم وابوداؤد والترمذی والنسائی وابن ماجة ثم قال واخرج ابن ابی شيبة واحمد وابوداؤد والترمذی وصححه والنسائی وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه عن بُرَيْدَةَ مَرْفُوْعًا اَلْعَهْدُ الَّذِیْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, নামায ছাড়িয়া দেওয়া মানুষকে কুফরের সহিত মিলাইয়া দেয়। অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে যে, বান্দা এবং কুফরকে মিলানোর বস্তু একমাত্র নামায ছাড়িয়া দেওয়া। আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হইল নামায ত্যাগ করা। (তারগীব)

ফায়দা ঃ এইরূপ বর্ণনা আরও কতিপয় হাদীসে আসিয়াছে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে জলদি নামায পড়িয়া লও। কেননা নামায ত্যাগ করিলে মানুষ কাফের হইয়া যায়। অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, মেঘের কারণে নামাযের ওয়াক্তের খবর হইল না এবং নামায কাযা হইয়া গেল। ইহাকেও নামায ত্যাগ করা বলিয়াছেন। কত বড় কঠিন কথা যে, আল্লাহর নবী নামায ত্যাগকারীর উপর কুফরের হুকুম লাগাইতেছেন। যদিও ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসে 'নামায ত্যাগ করা'র অর্থ 'নামাযকে অস্বীকার করা' বুঝাইয়াছেন, তথাপি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মর্ম ও গুরুত্ব এত অপরিসীম যে, যাহার অন্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজমত ও মর্যাদার সামান্যতম অনুভূতিও থাকিবে সে ইহার মূল্য বুঝিতে পারিবে এবং তাহার নিকট ইহা অত্যন্ত মারাত্মক বলিয়া মনে হইবে। ইহা ছাড়া বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম যেমন হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখের অভিমতও এই যে, বিনা ওজরে জানিয়া শুনিয়া নামায ত্যাগকারী কাফের। ইমামগণের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ

ও ইবনে মুবারক (রহঃ)এরও অভিমত ইহাই বর্ণনা করা হয়। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। (তারগীব)

(٢) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ
اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ خِصَالٍ فَقَالَ
لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّاِنْ قُطِّعْتُمْ اَوْ
حُرِّقْتُمْ اَوْ صُلِّبْتُمْ وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلٰوةَ
مُتَعَمِّدِيْنَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ
خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ وَلَا تَرْكَبُوا الْمَعْصِيَةَ
فَاِنَّهَا سَخَطُ اللّٰهِ وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ
فَاِنَّهَا رَأْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا ۔

حضرت عبادہؓ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سات نصیحتیں کی ہیں جن
میں سے چار یہ ہیں اوّل یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ
چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جاویں یا تم جلا دیئے
جاؤ یا تم سولی چڑھا دیئے جاؤ۔ دوسری یہ کہ جان کر
نماز نہ چھوڑو۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب
سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
نہ کرو کہ اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی یہ
کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔

(الحديث رواه الطبرانى ومحمد بن نصر فى كتاب الصلوٰة باسنادين لا باس بهما كذا فى الترغيب وهكذا ذكره السيوطى فى الدر المنثور وعزاه اليهما فى المشكوٰة برواية ابن ماجة عن ابن ابى الدرداء نحوه)

(২) হযরত উবাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমাকে আমার প্রিয় হাবীব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি নসীহত করিয়াছেন। তন্মধ্যে চারটি এই— (১) তুমি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিও না ; যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয় কিংবা তোমাকে আগুনে জ্বালাইয়া দেওয়া হয় অথবা তোমাকে শূলিতে চড়ানো হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করিও না ; কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, সে দ্বীন হইতে বাহির হইয়া যায়। (৩) আল্লাহ তায়ালার না–ফরমানী করিও না। কেননা, ইহাতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন। (৪) শরাব পান করিও না। কেননা, ইহা যাবতীয় পাপ কাজের মূল।

(তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ অন্য এক হাদীসে হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) হইতেও এইরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আমাকে আমার প্রিয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওছিয়ত করিয়াছেন যে, আল্লাহর সাথে কাহাকেও শরীক করিও না ; যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয় কিংবা তোমাকে আগুনে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ

ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করিও না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কোন জিম্মাদারী নাই। তৃতীয়তঃ শরাব পান করিওনা। কারণ ইহা সকল পাপকাজের চাবি।

(٣) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ
اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ
شَيْئًا وَّاِنْ قُتِلْتَ اَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ
وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ
اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلٰوةً
مَّكْتُوْبَةً مُّتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ
صَلٰوةً مَّكْتُوْبَةً مُّتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ
مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهٗ
رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَ
الْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ
اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ
وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِنْ اَصَابَ النَّاسَ
مَوْتٌ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى اَهْلِكَ
مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ
اَدَبًا وَّاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ ۔

حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی وصیت فرمائی۔ ا۔
یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا گو تو قتل کر دیا
جائے یا جلا دیا جائے۔ ۲۔ والدین کی نافرمانی نہ کرنا گو وہ
تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا
مال خرچ کر دے۔ ۳۔ فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا
جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا
ذمہ اس سے بری ہے۔ ۴۔ شراب نہ پینا کہ یہ
ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ ۵۔ اللہ کی نافرمانی
نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا
ہے۔ ۶۔ لڑائی میں نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی
مر جائیں۔ ۷۔ اگر کسی جگہ وبا پھیل جاوے
(جیسے طاعون وغیرہ) تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ ۸۔
اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا۔
۹۔ تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔
۱۰۔ اللہ تعالیٰ سے اُن کو ڈراتے رہنا۔

(رواه احمد والطبرانى فى الكبير واسناد احمد صحيح لو سلم من الانقطاع فان عبد الرحمٰن ابن جبير لم يسمع من معاذ كذا فى الترغيب واليهما عزاه السيوطى فى الدر ولم يذكر الانقطاع ثم قال واخرج الطبرانى عن اميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت اصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه فدخل رجل فقال اوصنى فقال لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حرقت ولا تعص والديك وان امراك ان تخلى من اهلك ودنياك فتخله ولا تشربن خمرا فانه مفتاح كل شر ولا تتركن صلوٰة متعمدا فمن فعل ذلك فقد برأت منه ذمة الله ورسوله)

—৭

(৩) হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, আমাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি বিষয়ের ওসিয়ত করিয়াছেন ঃ

(১) আল্লাহর সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিও না ; যদিও তোমাকে কতল করা হয় কিংবা আগুনে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।

(২) পিতামাতার নাফরমানী করিও না ; যদিও তাহারা তোমাকে স্ত্রী অথবা সমুদয় ধন-সম্পদ ত্যাগ করিতে বলেন।

(৩) ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামায ত্যাগ করিও না। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামায ত্যাগ করে তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালার কোন জিম্মাদারী থাকে না।

(৪) শরাব পান করিও না। কারণ, ইহা যাবতীয় মন্দ ও নির্লজ্জ কাজের মূল।

(৫) আল্লাহ তায়ালার না-ফরমানী করিও না। কারণ, ইহাতে আল্লাহ তায়ালার গজব নাযিল হয়।

(৬) জেহাদ হইতে পলায়ন করিও না ; যদিও তোমার সকল সাথী মারা যায়।

(৭) যদি কোন এলাকায় মহামারী ছড়াইয়া পড়ে (যেমন প্লেগ ইত্যাদি), তবে সেখান হইতে পলায়ন করিও না।

(৮) নিজ পরিবারের লোকদের জন্য সাধ্যমত খরচ করিও।

(৯) তাহাদের উপর হইতে শাসনের লাঠি হটাইও না।

(১০) তাহাদিগকে আল্লাহর ভয় দেখাইতে থাকিও।

(তারগীব ঃ আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা ঃ লাঠি না হটানোর অর্থ হইল, সন্তানরা যাহাতে বে-ফিকির না হইয়া যায় যে, পিতা যখন শাসন করিতেছেন না বা মারধর করিতেছেন না, কাজেই যাহা ইচ্ছা করিতে থাকি। অতএব শরীয়তের সীমার ভিতর থাকিয়া কখনও কখনও মারধর করা চাই। কেননা, মারধর ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানের শাসন হয় না। আজকাল প্রথম অবস্থায় সন্তানদেরকে মহব্বতের জোশে শাসন করা হয় না। পরবর্তীতে যখন তাহারা বদ অভ্যাসে পাকা হইয়া যায় তখন কাঁদিয়া বেড়ায়। অথচ সন্তানকে মন্দকাজ হইতে বাধা না দেওয়া ও মারধর করাকে মহব্বতের খেলাফ মনে করা তাহার সহিত মহব্বত নহে বরং শক্ত দুশমনী। এমন বুদ্ধিমান কে আছে যে কষ্ট পাইবে মনে করিয়া আপন সন্তানের ফোঁড়ার অপারেশন করায় না? বরং ছেলে যতই কান্নাকাটি করুক, চেহারা বিকৃত করুক, ভাগিয়া যাওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, অপারেশন করাইতেই হয়।

বহু হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, সন্তানকে সাত বৎসর বয়সে নামাযের হুকুম কর এবং দশ বৎসর বয়সে নামায না পড়ার দরুন মারপিট কর। (দুররে মানসূর)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, বাচ্চাদের নামাযের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ এবং তাহাদিগকে ভাল কথা ও ভাল অভ্যাস শিক্ষা দাও। হযরত লোকমান হাকীম (আঃ) বলিয়াছেন, পিতার মারধর সন্তানের জন্য এমন যেমন ক্ষেতের জন্য পানি। (দুররে মানসূর) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সন্তানকে শাসন করা আল্লাহর রাস্তায় এক ছা' (অর্থাৎ সাড়ে তিন সের) পরিমাণ সদকা করা হইতেও উত্তম। (দুররে মানসূর) এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল করুন, যে পরিবারের লোকদের শাসনের উদ্দেশ্যে ঘরে চাবুক লটকাইয়া রাখে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, কোন পিতা সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার সমতুল্য পুরস্কার আর কিছুই দিতে পারে না। (জামে সগীর)

(۴) عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعٰوِيَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهٗ وَمَالَهٗ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔

(رواہ ابن حبان فی صحیحہ کذا فی الترغیب زاد السیوطی فی الدر والنسائی ایضا قلت ورواہ احمد فی مسندہ)

(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে-ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামায ছুটিয়া গেল, তাহার যেন পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছুই লুট হইয়া গেল। (তারগীব ঃ ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ সাধারণতঃ সন্তান-সন্ততির কারণে—তাহাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার মধ্যে মশগুল থাকার কারণে নামায নষ্ট করা হয়। কিংবা ধন-সম্পদ কামাইয়ের লোভে নষ্ট করা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নামায নষ্ট করার পরিণতি এমনই যেমন সন্তান-সন্ততি ও মাল-সম্পদ সবকিছুই লুট হইয়া গেল এবং সে একা রহিয়া গেল। অর্থাৎ এই অবস্থায় যত বড় ক্ষতি ও লোকসান হয়, নামায ছুটিয়া গেলেও তদ্রূপ হয়। অথবা ঐ অবস্থায় যে পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট ও মনে ব্যথা হয়, নামায ছুটিয়া গেলে তদ্রূপ হওয়া চাই। যদি কোন বিশ্বস্থ

ব্যক্তি কাহাকেও এই মর্মে সাবধান করিয়া দেয় এবং তাহার বিশ্বাসও হয় যে, এই পথে ডাকাতরা লুটতরাজ করে, রাত্রে যাহারা এই রাস্তা দিয়া যায় ডাকাতরা তাহাদেরকে কতল করিয়া দেয় এবং মালামাল লুট করিয়া নেয়, তবে এমন বীরপুরুষ কে আছে যে রাত্রিবেলায় এই পথে যাইবে। রাত্রে তো দূরের কথা দিনের বেলায়ও এই পথে যাওয়ার সাহস করিবে না। অথচ আল্লাহর প্রিয় সত্যবাদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র বাণী এক দুইটি নহে বরং বহুসংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আফসোস ! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদী হওয়ার দাবীও আমরা আমাদের মিথ্যা জবানে করি ; কিন্তু তাঁহার এই পবিত্র বাণীর কী প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর হয়—তাহা সকলেরই জানা আছে।

(٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اَتٰى بَابًا مِّنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر پہنچ گیا ۔

(رواہ الحاکم وقال حنش هو ابن قیس ثقة وقال الحافظ بل واه بمرة لانعلم احد اوثقه غیر حصین بن نمیر کذا فی الترغیب زاد السیوطی فی الدر الترمذی ایضا و ذکر فی اللآلی له شواهد وکذا فی التعقبات و قال الحدیث اخرجه الترمذی وقال حنش ضعیف ضعفه احمد وغیره والعمل علی هٰذا عند اهل العلم فاشار بذٰلك الی ان الحدیث اعتضد بقول اهل العلم وقد صرح غیر واحد بان من دلیل صحة الحدیث قول اهل العلم به وان لم یکن له اسناد یعتمد علی مثله اھ)

(৫) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত দুই ওয়াক্ত নামায একসঙ্গে পড়িল, সে কবীরা গোনাহের দরজাসমূহের মধ্য হইতে একটিতে প্রবেশ করিল।

(তারগীব ঃ হাকিম, দুররে মানসূর ঃ তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তিন কাজে বিলম্ব করিও না ।

প্রথম ঃ নামায, যখন উহার সময় হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ঃ জানাযা, যখন উহা তৈয়ার হইয়া যায়।

তৃতীয় ঃ অবিবাহিতা নারী, যখন তাহার উপযুক্ত স্বামী মিলিয়া যায়। (অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ দিয়া দাও) অনেক লোক যাহারা নিজদিগকে

দ্বীনদারও মনে করে এবং নামাযের পাবন্দি করে বলিয়াও মনে করে, তাহারা সফর অথবা দোকান বা চাকুরী ইত্যাদি কাজের সামান্য অজুহাতে কয়েক ওয়াক্ত নামায একত্রে ঘরে আসিয়া পড়িয়া নেয়—অসুস্থতা বা অন্য কোন ওজর ব্যতীত নামাযকে সময় মত না পড়া কবীরা গোনাহ। যদিও একেবারে নামায না পড়ার সমান গোনাহ না হউক। সময় মত নামায না পড়াও কঠিন গোনাহ, এই গোনাহ হইতে সে রক্ষা পাইল না।

(٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَّ نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَّهُ نُوْرٌ وَّلَا بُرْهَانٌ وَّ لَا نَجَاةٌ وَّكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ ۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اُس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجّت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اُس کیلئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اُس کے پاس کوئی حجّت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ اس کا حشر فرعون ہامان اور اُبَیّ بن خلف کے ساتھ ہوگا ۔

(اخرجه احمد وابن حبان والطبرانی کذا فی الدر المنثور للسیوطی وقال الهیثمی رواه احمد والطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجال احمد ثقات وقال ابن حجر فی الزواجر اخرجه احمد بسند جید وزاد فیه قارون ایضا مع فرعون وغیره وکذا زاده فی منتخب الکنز بروایة ابن نصر والمشکوٰة ایضا بروایة احمد والدارمی والبیهقی فی الشعب وابن قیم فی کتاب الصلوٰة)

(৬) একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের বিষয় উল্লেখ করিয়া এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে, তাহার জন্য নামায কিয়ামতের দিন নূর হইবে এবং হিসাবের সময় দলীল হইবে এবং নাজাতের উপায় হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে না, কিয়ামতের দিন নামায তাহার জন্য নূর হইবে না, আর তাহার নিকট কোন দলীলও থাকিবে না এবং নাজাতের জন্য কোন উপায়ও হইবে না। এইরূপ ব্যক্তির হাশর ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খলফের সহিত হইবে। (দুররে মানসূর, আহমদ, ইবনে হিব্বান, তাবারানী)

ফায়দা ঃ ফেরআউন যে কত বড় কাফের ছিল তাহা সকলের জানা আছে। এমনকি সে খোদায়ী দাবী করিয়াছিল। আর হামান হইল তাহার

মন্ত্রীর নাম। আর উবাই ইবনে খলফ মক্কার মুশরিকদের মধ্যে ইসলামের জঘন্যতম দুশমন ছিল। হিজরতের পূর্বে সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিত, আমি একটি ঘোড়া পালিতেছি এবং উহাকে অনেক কিছু খাওয়াইতেছি। উহার উপর আরোহণ করিয়া আমি তোমাকে হত্যা করিব (নাঊযু বিল্লাহ)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাহাকে বলিয়াছিলেন, ইনশাআল্লাহ আমিই তোমাকে কতল করিব। উহুদের যুদ্ধে সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করিতেছিল আর বলিতেছিল, আজ যদি তিনি বাঁচিয়া যান তবে আমার আর রক্ষা নাই। অতএব হামলা করার উদ্দেশ্যে সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হইয়া গেল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) এরাদাও করিয়াছিলেন যে, দূর হইতেই তাহাকে শেষ করিয়া দিবেন কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহাকে আসিতে দাও। সে যখন নিকটবর্তী হইল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীর হাত হইতে একটি বর্শা লইয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। যাহা তাহার ঘাড়ে গিয়া লাগিল এবং ঘাড়ের উপর সামান্য আঁচড়ের ন্যায় ক্ষত হইল। এই সামান্য আঘাতেই সে ঘোড়া হইতে গড়াইয়া পড়িয়া গেল এবং এইভাবে কয়েকবার পড়িল। দ্রুত ছুটিয়া আপন দলের নিকট পৌঁছিয়া গেল এবং চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে কতল করিয়া দিয়াছে। দলের কাফেররা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, সামান্য আঁচড় লাগিয়াছে ; চিন্তার কোন কারণ নাই। কিন্তু সে বলিতেছিল যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমাকে কতল করিব। খোদার কসম, মুহাম্মদ যদি আমার উপর থুথুও নিক্ষেপ করিতেন তবু আমি মরিয়া যাইতাম।

কথিত আছে, তাহার চিৎকারের আওয়াজ ষাড়ের চিৎকারের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। আবূ সুফিয়ান যিনি এই যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে বড় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তিনি তাহাকে লজ্জা দিয়া বলিলেন, এই সামান্য একটু আঁচড়ে এমন চিৎকার করিতেছ। সে বলিল, তুমি কি জান, এই আঘাত কে করিয়াছেন? ইহা মুহাম্মদের আঘাত। এই আঘাতে আমার যে পরিমাণ কষ্ট হইতেছে—লাত ও উজ্জার (দুইটি প্রসিদ্ধ মূর্তির নাম) কসম করিয়া বলিতেছি, উহা যদি সমগ্র হিজাযবাসীকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় তবে সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। মুহাম্মদ যখন আমাকে কতল করিবার কথা বলিয়াছিল তখনই আমি বুঝিয়া নিয়াছিলাম

যে, অবশ্যই আমি তাহার হাতে নিহত হইব, রেহাই পাওয়ার আর কোন উপায় আমার নাই। আমাকে কতল করার কথা বলিবার পর তিনি যদি আমার উপর থুথুও নিক্ষেপ করিতেন তবু আমি মরিয়া যাইতাম। অবশেষে মক্কায় পৌঁছার একদিন পূর্বে পথিমধ্যেই সে মারা গেল।

উপরোক্ত ঘটনায় মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত লজ্জা ও শিক্ষার বিষয় এই যে, একজন পাক্কা কাফেরও ইসলামের ঘোরতর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সত্য হওয়ার ব্যাপারে তাহার কি পরিমাণ দৃঢ় একীন ও বিশ্বাস ছিল যে, তাহাঁর হাতে নিহত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বলিয়া স্বীকার করি, তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করি, তাঁহার বাণীসমূহকে অকাট্য সত্য মনে করি, তাহার সহিত মহব্বতের দাবী করি, তাঁহার উম্মত হওয়ার কারণে গর্ববোধ করি, এতদসত্ত্বেও তাঁহার কয়টি হাদীসের উপর আমল করিতেছি? যে সমস্ত বিষয়ে তিনি আজাবের হুঁশিয়ারী দিয়াছেন, সেই সব বিষয়ে আমরা কতটুকু ভীত-সন্ত্রস্ত হইতেছি। নিজের ভিতরে কি আছে তাহা প্রত্যেকেরই নিজের দেখার বিষয়। একের ব্যাপারে অন্যে কি করিয়া বলিতে পারে।

ইবনে হজর (রহঃ) তাঁহার 'যাওয়াজির' কিতাবে ফেরআউন হামানের সাথে কারূণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাহাদের সহিত হাশর হওয়ার কারণ এই যে, ইহাদের মধ্যে যে সমস্ত দোষ পাওয়া যায়, সাধারণতঃ সেই সমস্ত দোষের কারণেই নামাযের মধ্যে অবহেলা করা হয়। সুতরাং নামাযে অবহেলা যদি ধন-সম্পদের কারণে হয়, তবে তাহার হাশর হইবে কারূণের সহিত। আর যদি হুকূমত ও রাজত্বের কারণে হয়, তবে তাহার হাশর হইবে ফেরআউনের সহিত। আর যদি মন্ত্রিত্ব (অর্থাৎ চাকরী বা মোসাহিবী)এর কারণে হয়, তবে তাহার হাশর হইবে হামানের সহিত। আর যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে হয়, তবে তাহার হাশর হইবে উবাই ইবনে খলফের সহিত। মোটকথা তাহাদের সহিত হাশর হওয়া যখন সাব্যস্ত হইল তখন বিভিন্ন আজাব সম্পর্কিত হাদীসগুলি সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত যাহাই হউক কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, জাহান্নামের আজাব কঠিন হইতে কঠিনতর। অবশ্য ইহাও সত্য যে, ঈমানের কারণে একদিন না একদিন জাহান্নাম হইতে নাজাত লাভ হইবে আর ঐ কাফেররা চিরকাল সেখানে থাকিবে। কিন্তু নাজাতের পূর্ব পর্যন্ত সময়টাও কি হাসি-তামাশার ব্যাপার! কে জানে কত হাজার বছর দীর্ঘ হইবে।

(٧) قَالَ بَعْضُهُمْ وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ اَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلٰوةِ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِخَمْسِ خِصَالٍ يَرْفَعُ عَنْهُ ضِيْقَ الْعَيْشِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَيُعْطِيْهِ اللّٰهُ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَمَنْ تَهَاوَنَ عَنِ الصَّلٰوةِ عَاقَبَهُ اللّٰهُ بِخَمْسَ عَشَرَةَ عُقُوْبَةً خَمْسَةٌ فِي الدُّنْيَا وَثَلٰثَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَثَلٰثٌ فِيْ قَبْرِهٖ وَثَلَاثٌ عِنْدَ خُرُوْجِهٖ مِنَ الْقَبْرِ فَاَمَّا اللَّوَاتِيْ فِي الدُّنْيَا فَالْاُوْلٰى تُنْزَعُ الْبَرَكَةُ مِنْ عُمْرِهٖ وَالثَّانِيَةُ تُمْحٰى سِيْمَاءُ الصَّالِحِيْنَ مِنْ وَجْهِهٖ وَالثَّالِثَةُ كُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهٗ لَا يَأْجُرُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالرَّابِعَةُ لَا يُرْفَعُ لَهٗ دُعَاءٌ اِلَى السَّمَاءِ وَالْخَامِسَةُ لَيْسَ لَهٗ حَظٌّ فِيْ دُعَاءِ الصَّالِحِيْنَ وَاَمَّا الَّتِيْ تُصِيْبُهٗ عِنْدَ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ يَمُوْتُ ذَلِيْلًا وَالثَّانِيَةُ يَمُوْتُ جُوْعًا وَالثَّالِثَةُ يَمُوْتُ عَطْشَانًا وَلَوْ سُقِيَ بِحَارَ الدُّنْيَا مَا رَوِيَ مِنْ عَطْشِهٖ وَاَمَّا الَّتِيْ تُصِيْبُهٗ فِيْ قَبْرِهٖ فَالْاُوْلٰى يَضِيْقُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالیٰ شانہٗ پانچ طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹادیجاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹادیا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے، (جن کا حال سورۃ الحاقہ میں مفصّل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامۂ اعمال داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے) اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گذر جائیں گے پانچویں بغیر حساب جنّت میں داخل ہونگے اور جو شخص نماز میں سُستی کرتا ہے اُس کو پندرہ طریقہ سے عذاب ہوتا ہے پانچ طرح دنیا میں اور تین طرح سے موت کے وقت اور تین طرح قبر میں اور تین طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے پانچ تو یہ ہیں اوّل یہ کہ اسکی زندگی میں برکت نہیں رہتی دوسرے یہ کہ صُلحاء کا نور اُس کے چہرہ سے ہٹا دیا جاتا ہے تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے چوتھے اُسکی دُعائیں قبول نہیں ہوتیں پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا اِستحقاق نہیں رہتا اور موت کے وقت کے تین عذاب یہ ہیں کہ اوّل ذِلّت سے مرتا ہے دوسرے بھوکا مرتا ہے تیسرے

حَتّٰى تَخْتَلِفَ اَضْلَاعُهٗ وَالثَّانِيَةُ يُوْقَدُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ نَارًا فَيَتَقَلَّبُ عَلَى الْجَمْرِ لَيْلًا وَّنَهَارًا وَالثَّالِثَةُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ فِيْ قَبْرِهٖ ثُعْبَانٌ اِسْمُهُ الشُّجَاعُ الْاَقْرَعُ عَيْنَاهُ مِنْ نَارٍ وَاَظْفَارُهٗ مِنْ حَدِيْدٍ طُوْلُ كُلِّ ظُفْرٍ مَسِيْرَةُ يَوْمٍ يُكَلِّمُ الْمَيِّتَ فَيَقُوْلُ اَنَا الشُّجَاعُ الْاَقْرَعُ وَصَوْتُهٗ مِثْلُ الرَّعْدِ الْقَاصِفِ يَقُوْلُ اَمَرَنِيْ رَبِّيْ اَنْ اَضْرِبَكَ عَلٰى تَضْيِيْعِ صَلٰوةِ الصُّبْحِ اِلٰى بَعْدِ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَاَضْرِبَكَ عَلٰى تَضْيِيْعِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ اِلَى الْعَصْرِ وَاَضْرِبَكَ عَلٰى تَضْيِيْعِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلَى الْمَغْرِبِ وَاَضْرِبَكَ عَلٰى تَضْيِيْعِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ اِلَى الْعِشَاءِ وَاَضْرِبَكَ عَلٰى تَضْيِيْعِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ فَكُلَّمَا ضَرَبَهٗ ضَرْبَةً يَغُوْصُ فِي الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا فَلَا يَزَالُ فِي الْقَبْرِ مُعَذَّبًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاَمَّا الَّتِيْ تُصِيْبُهٗ عِنْدَ خُرُوْجِهٖ مِنَ الْقَبْرِ

پیاس کی شِدّت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے تین عذاب یہ ہیں اوّل اس پر قبر اتنی تنگ ہوجاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھُس جاتی ہیں۔ دوسرے قبر میں آگ جلادی جاتی ہے تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مُسلّط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لانبے کہ ایک دن پورا چل کر اُس کے ختم تک پہنچا جائے اُس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے ربّ نے تجھ پر مُسلّط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اُس کی وجہ سے وہ مُردہ ستّر ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے اسی طرح قیامت تک اُسکو عذاب ہوتا رہیگا اور قبر سے نکلنے کے بعد کے تین عذاب یہ ہیں ایک حساب سختی سے کیا جائے

فِیْ مُوْقِفِ الْقِیَامَةِ فَشِدَّةُ الْحِسَابِ
وَسَخَطُ الرَّبِّ وَدُخُوْلُ النَّارِ وَفِیْ
رِوَایَةٍ فَاِنَّهٗ یَأْتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
وَعَلٰی وَجْهِهٖ ثَلٰثَةُ اَسْطُرٍ
مَکْتُوْبَاتٌ اَلسَّطْرُ الْاَوَّلُ یَا مُضَیِّعَ
حَقِّ اللّٰهِ اَلسَّطْرُ الثَّانِیْ یَا مَخْصُوْصًا
بِغَضَبِ اللّٰهِ الثَّالِثُ کَمَا ضَیَّعْتَ
فِی الدُّنْیَا حَقَّ اللّٰهِ فَاٰیِسٌ الْیَوْمَ
اَنْتَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ۔

گا دوسرے حق تعالیٰ شانہٗ کا اس پر غصہ
ہوگا تیسرے جہنم میں داخل کردیا جائیگا
یہ کل میزان چودہ ہوتی ممکن ہے کہ پندرھواں
بھول سے رہ گیا ہو اور ایک روایت میں یہ
بھی ہے کہ اُس کے چہرہ پر تین سطریں لکھی
ہوتی ہوتی ہیں پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع
کرنے والے دوسری سطر او اللہ کے غصے کے
ساتھ مخصوص تیسری سطر جیسا کہ تونے دنیا
میں اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت
سے مایوس ہے۔

(وماذکر فی ھذا الحدیث من تفصیل العدد لایطابق جملة الخمس عشرة لان المفصل اربع عشرة فقط فلعل الراوی نسی الخامس عشر کذا فی الزواجر لابن حجر المکی قلت وھو کذلک فان ابا اللیث السمرقندی ذکر الحدیث فی قرة العیون فجعل ستة فی الدنیا فقال الخامسة تمقته الخلائق فی الدار الدنیا والسادس لیس له حظ فی دعاء الصالحین ثم ذکر الحدیث بتمامه ولم یعزه الی احد وفی تنبیه الغافلین للشیخ نصر بن محمد بن ابراھیم السمرقندی یقال من داوم علی الصلوة الخمس فی الجماعة اعطاه الله خمس خصال ومن تھاون بھا فی الجماعة عاقبه الله باثنی عشر خصلة ثلثة فی الدنیا وثلثة عند الموت وثلثة فی القبر وثلثة یوم القیامة ثم ذکر نحوھا ثم قال وروی عن ابی ذر عن النبی صلی الله علیه وسلم نحو ھذا وذکر السیوطی فی ذیل اللآلی بعد ما اخرج بمعناه من تخریج ابن النجار فی تاریخ بغداد بسنده الی ابی ھریرة قال فی المیزان ھذا حدیث باطل رکبه محمد بن علی بن عباس علی ابی بکر بن زیاد النیسابوری قلت لکن ذکر الحافظ فی المنبھات۔ عن ابی ھریرة مرفوعًا الصلوة عماد الدین وفیھا عشر خصال الحدیث ذکرته فی الھندیة وذکر الغزالی فی دقائق الاخبار بنحو ھذا اتم منه وقال من حافظ علیھا اکرمه الله بخمس عشرة الخ مفصلًا)

(৭) এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাঁচ প্রকারে সম্মানিত করেন। প্রথমতঃ

তাহার উপর হইতে রুজি–রোজগারের অভাব দূর করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহার উপর হইতে কবরের আজাব হটাইয়া দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ কিয়ামতের দিন তাহার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে। (যাহাদের অবস্থা সূরায়ে আল–হাক্কাতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যাহাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে তাহারা খুবই আনন্দ ও খুশির সহিত প্রত্যেককে দেখাইতে থাকিবে) চতুর্থতঃ সে ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত পার হইয়া যাইবে। পঞ্চমতঃ বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

আর যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে অলসতা করে তাহাকে পনের প্রকারের শাস্তি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার দুনিয়াতে, তিন প্রকার মৃত্যুর সময়, তিন প্রকার কবরে, আর তিন প্রকার কবর হইতে বাহির হওয়ার পর। দুনিয়াতে পাঁচ প্রকার এই—এক ঃ তাহার জীবনে কোন বরকত থাকে না। দ্বিতীয় ঃ তাহার চেহারা হইতে নেককারদের নূর দূর করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় ঃ তাহার নেক কাজসমূহের কোন বদলা দেওয়া হয় না। চতুর্থ ঃ তাহার কোন দোয়া কবূল হয় না। পঞ্চম ঃ নেক বান্দাদের দোয়ার মধ্যেও তাহার কোন হক থাকে না।

মৃত্যুর সময় তিন প্রকার শাস্তি এই—এক ঃ জিল্লতির সহিত মৃত্যুবরণ করে। দ্বিতীয় ঃ ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাহার মৃত্যুবরণ করে। তৃতীয় ঃ এমন কঠিন পিপাসার অবস্থায় মারা যায় যে, সমুদ্র পরিমাণ পানি পান করিলেও তাহার পিপাসা মিটে না।

কবরের তিন প্রকার শাস্তি এই—এক ঃ কবর তাহার জন্য এমন সংকীর্ণ হইয়া যায় যে, বুকের একদিকের হাড়গুলি অপর দিকে ঢুকিয়া যায়। দ্বিতীয় ঃ তাহার কবরে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় ঃ কবরে তাহার উপর এমন আকৃতির একটি সাপ নিযুক্ত হয় যাহার চক্ষুগুলি আগুনের এবং নখগুলি লোহার হইবে। এত দীর্ঘ হইবে যে, পুরা একদিন চলিয়া উহার শেষ পর্যন্ত পৌছা যাইবে। উহার আওয়াজ বজ্রের মত হইবে। সে বলিতে থাকিবে, আমাকে আমার রব তোর উপর নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন ফজরের নামায নষ্ট করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত তোকে দংশন করিতে থাকি, যোহরের নামায নষ্ট করার কারণে আছর পর্যন্ত দংশন করিতে থাকি, পুনরায় আছরের নামায নষ্ট করার কারণে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, মাগরিবের নামায নষ্ট করার কারণে এশা পর্যন্ত এবং এশার নামায নষ্ট করার কারণে সকাল পর্যন্ত দংশন করতে থাকি। এই সাপ যখন তাহাকে একবার দংশন করে তখন উহার কারণে মুর্দা সত্তর হাত মাটির

নীচে ঢুকিয়া যায়। এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার আজাব হইতে থাকিবে।

কবর হইতে বাহির হওয়ার পর তিন প্রকার আজাব এই—এক ঃ তাহার হিসাব কঠিনভাবে লওয়া হইবে। দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রাগান্বিত থাকিবেন। তৃতীয় ঃ তাহাকে জাহান্নামে দাখিল করিয়া দেওয়া হইবে।

এই পর্যন্ত সর্বমোট চৌদ্দটি হইয়াছে। সম্ভবতঃ পনের নম্বরটি ভুলবশতঃ রহিয়া গিয়াছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার মুখমণ্ডলে তিনটি লাইন লেখা থাকিবে। প্রথম লাইন ঃ ওহে আল্লাহর হক নষ্টকারী। দ্বিতীয় লাইন ঃ ওহে আল্লাহর গোস্বায় পতিত। তৃতীয় লাইন ঃ দুনিয়াতে তুই যেরূপ আল্লাহর হক নষ্ট করিয়াছিস আজ তুই আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইয়া যা।

(যাওয়াজির ইবনে হজর মক্কী (রহঃ)

ফায়দা ঃ এই হাদীসের সম্পূর্ণটা যদিও আমি সাধারণ হাদীস গ্রন্থসমূহে পাই নাই। কিন্তু ইহাতে যত প্রকার সওয়াব ও আযাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে উহার অধিকাংশেরই সমর্থন বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কিছু রেওয়ায়াত পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে আর কিছু পরে আসিতেছে। পূর্বে উল্লেখিত রেওয়ায়াতসমূহে বে-নামাযী ইসলাম হইতে বাহির হইয়া যায় বলা হইয়াছে। এমতাবস্থায় আজাব যতই হইবে উহাকে কমই বলিতে হইবে। অবশ্য ইহা সত্য যে, এই হাদীসে যাহা কিছু উল্লেখিত হইয়াছে এবং পরে যাহা কিছু আসিতেছে সবই নামায ত্যাগ করার শাস্তি। আর এই শাস্তিযোগ্য অপরাধের পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণাও রহিয়াছে—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শিরকের গোনাহ মাফ করিবেন না। ইহা ছাড়া অন্য গোনাহের ব্যাপারে যাহাকে ইচ্ছা হইবে মাফ করিয়া দিবেন। (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৪৮)

অতএব এই আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে যদি এইরূপ অপরাধীকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দেন, তবে উহা অশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন তিনটি আদালত বসিবে। একটি কুফর ও ইসলামের আদালত—এই আদালতে ক্ষমার কোন প্রশ্নই নাই। দ্বিতীয় হুকূকুল এবাদ

অর্থাৎ বান্দার হকের আদালত—এই আদালতে হকদারদের হক অবশ্যই আদায় করিয়া দেওয়া হইবে—যাহার নিকট পাওনা রহিয়াছে তাহার নিকট হইতে লইয়া দেওয়া হইবে অথবা দেনাদারকে যদি আল্লাহ মাফ করিতে চাহেন, তবে তিনি নিজেই পাওনাদারের হক আদায় করিয়া দিবেন। তৃতীয় হুকূকুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর হকের আদালত—এই আদালতে আল্লাহ পাক নিজের বখশিশ ও ক্ষমার দরজা খুলিয়া দিবেন।

এইসব রেওয়ায়াত ও বর্ণনার কারণে এই কথা অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, আপন কৃতকর্মের শাস্তি তো উহাই যাহা হাদীসসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। তবে রাহমান রাহীমের দয়া ও মেহেরবানী এই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। উপরে যেইসব আজাব ও সওয়াবের কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা ছাড়া অন্যান্য হাদীসে আরও বিভিন্ন প্রকার আজাব ও সওয়াবের কথা আসিয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি ফজরের নামাযের পর সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কিনা। যদি কেহ দেখিত তবে বর্ণনা করিত। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার তাবীর বা ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেন।

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাস মত জিজ্ঞাসা করিলেন অতঃপর ফরমাইলেন যে, আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, দুইজন লোক আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। অতঃপর দীর্ঘ স্বপ্ন বর্ণনা করিলেন। ইহাতে তিনি বেহেশত, দোযখ এবং দোযখের মধ্যে লোকদের বিভিন্ন প্রকার আজাব হইতে দেখিয়াছেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন যে, তাহার মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইতেছে এবং এতো জোরে পাথর মারা হইতেছে যে, সেই পাথর ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়ে। পাথরটিকে উঠাইয়া আনিতে আনিতে তাহার মাথা আগের মতই হইয়া যায়। আবার তাহার মাথায় সজোরে আঘাত করা হয়। এইরূপ আচরণ তাহার সহিত বারবার করা হইতেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সঙ্গীদ্বয়ের নিকট জানিতে চাহিলেন যে, এই লোকটি কে? তখন তাহারা বলিল, এই ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়া উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং ফরজ নামায না পড়িয়া ঘুমাইয়া যাইত।

অন্য এক হাদীসে একই ধরণের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের সাথে এইরূপ আচরণ করা হইতেছে দেখিয়া হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, এইসব লোক নামাযে অবহেলা করিত। (তারগীব)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যে সমস্ত লোক নামাযের ওয়াক্তের ব্যাপারে সচেতন থাকে, তাহাদের মধ্যে এমন বরকত হয় যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর আওলাদগণের মধ্যে হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত ঈমান রাখে, তাঁহার (আল্লাহ তায়ালার) এবাদত করে, নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে, আর এমতাবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় হয় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। (দুররে মানসূর)

হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ নকল করেন যে, আমি কোন এলাকায় আজাব নাযিল করার ইচ্ছা করি কিন্তু সেখানে এমন লোকদেরকে দেখিতে পাই, যাহারা মসজিদসমূহকে আবাদ করে, আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে মহব্বত করে, শেষ রাত্রে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, তখন আমি আজাব স্থগিত করিয়া দেই। (দুররে মানসূর)

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ)এর নামে এক চিঠিতে লিখিয়াছেন, অধিকাংশ সময় মসজিদে অতিবাহিত কর। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, মসজিদ মোত্তাকী লোকদের ঘর এবং আল্লাহ পাক এই কথার ওয়াদা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অধিকাংশ সময় মসজিদে কাটাইবে তাহার উপর রহমত নাযিল করিব, তাহাকে শান্তি দান করিব, কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের রাস্তা আছান করিয়া দিব এবং আমার সন্তুষ্টি নসীব করিব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ পাকের ঘর, আর যাহারা ঘরে আসে তাহাদের সম্মান ও একরাম হইয়াই থাকে ; অতএব আল্লাহর উপর ঐসব লোকের সম্মান করা জরুরী যাহারা মসজিদে হাযির হয়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন যে, যাহারা মসজিদের সহিত মহব্বত রাখে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত মহব্বত রাখেন।

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন যাহারা কবর পর্যন্ত সাথে গিয়াছিল তাহারা ফিরিবার পূর্বেই ফেরেশতাগণ পরীক্ষা লওয়ার জন্য হাজির হইয়া যান। মৃত ব্যক্তি মুমিন হইয়া থাকিলে নামায

তাহার মাথার নিকটে থাকে, যাকাত তাহার ডান দিকে, রোযা তাহার বাম দিকে এবং অন্যান্য নেক আমল তাহার পায়ের দিকে থাকে, এইভাবে চতুর্দিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া লয়। কেহ তাহার নিকটবর্তী হইতে পারে না। ফলে ফেরেশতাগণ দূর হইতেই দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করেন। (দুররে মানসূর)

এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কোন অভাব দেখা দিত, তখন তিনি পরিবার–পরিজনকে নামাযের হুকুম করিতেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝

অর্থাৎ আপনার পরিবার–পরিজনকে নামাযের হুকুম করুন এবং নিজেও নামাযের এহতেমাম করিতে থাকুন। আপনি রুজি উপার্জন করুন—ইহা আমি চাই না ; রুজি তো আমিই দিব। আর উত্তম পরিণতি পরহেজগারীর মধ্যেই রহিয়াছে। (সূরা ত্বহা, আয়াত ঃ ১৩২)

হযরত আসমা (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ এক জায়গায় জমা হইবে এবং ফেরেশতাগণ যে কোন আওয়াজই দিবেন সকলেই তাহা শুনিতে পাইবে। ঐ সময় ঘোষণা করা হইবে, কোথায় ঐ সকল লোক যাহারা সুখ–দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিত। ইহা শুনিয়া একদল উঠিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আবার ঘোষণা করা হইবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক যাহারা রাত্র জাগিয়া আরামের বিছানা ত্যাগ করিয়া এবাদত–বন্দেগীতে মশগুল থাকিত। অতঃপর এক জামাত উঠিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আবার ঘোষণা করা হইবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক যাহাদিগকে ব্যবসা–বাণিজ্য ও বেচা–কেনা আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল করিত না। অতঃপর এক জামাত উঠিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

অন্য এক হাদীসে এই ঘটনার সহিত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তখন ঘোষণা করা হইবে, আজ হাশরবাসী দেখিতে পাইবে যে, সম্মানিত লোক কাহারা? আরও ঘোষণা করা হইবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক যাহাদিগকে ব্যবসা–বাণিজ্যের ব্যস্ততা আল্লাহর যিকির ও নামায হইতে বাধা দিত না।

(দুররে মানসূর)

এই হাদীসটি শায়খ নসর সমরকন্দী (রহঃ) 'তাম্বীহুল গাফেলীন'

নামক কিতাবেও লিখিয়াছেন। অতঃপর লিখিয়াছেন যে, যখন এই সকল লোক বিনা হিসাবে মুক্তি পাইয়া যাইবে তখন জাহান্নাম হইতে একটি লম্বা গর্দান বাহির হইয়া আসিবে এবং উহা লোকদিগকে ডিঙ্গাইয়া চলিয়া আসিবে। উহার দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু থাকিবে এবং তাহার ভাষা খুবই স্পষ্ট হইবে। সে বলিবে, আমি ঐসব লোকদের উপর নিযুক্ত হইয়াছি, যাহারা অহংকারী ও বদমেজাজী এবং সমবেত লোকদের মধ্য হইতে তাহাদেরকে এমনভাবে বাছিয়া লইবে, যেভাবে পশুপক্ষী উহাদের খাদ্য বাছিয়া লয়। তাহাদিগকে বাছিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর এইরূপে দ্বিতীয় বার বাহির হইয়া বলিবে যে, এইবার আমি ঐ সমস্ত লোকদের উপর নিযুক্ত হইয়াছি যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়াছে। তাহাদিগকেও দল হইতে বাছিয়া লইয়া যাইবে। অতঃপর তৃতীয়বার বাহির হইয়া আসিবে এবং এইবার ছবি অংকনকারীদিগকে বাছিয়া লইয়া যাইবে। এই তিন প্রকার লোক ময়দান হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার পর হিসাব নিকাশ শুরু হইবে।

কথিত আছে, আগেকার যুগে মানুষ শয়তানকে দেখিতে পাইত। এক ব্যক্তি শয়তানকে বলিল, তুমি আমাকে এমন কোন পন্থা শিখাইয়া দাও, যাহা করিলে আমিও তোমার মত হইতে পারি। শয়তান বলিল, এমন আবদার তো আজ পর্যন্ত আমার নিকট কেহ করে নাই, তোমার কি প্রয়োজন দেখা দিল? লোকটি বলিল, আমার মন এরূপ চাহিতেছে। শয়তান বলিল, ইহার পন্থা এই যে, নামাযে অবহেলা করিও এবং সত্য-মিথ্যা কসম খাইয়া কথা বলিতে কোনই পরওয়া করিও না। লোকটি বলিয়া উঠিল, আমি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করিতেছি যে, জীবনে কখনও নামায ছাড়িব না এবং কসমও খাইব না। ইহা শুনিয়া শয়তান বলিল, আজ পর্যন্ত চালবাজি করিয়া তুমি ছাড়া আর কেহ আমার নিকট হইতে কথা নিতে পারে নাই। আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, মানুষকে কখনও উপদেশ দিব না।

হযরত উবাই (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এই উম্মতকে উচ্চ মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান ও দ্বীনের উন্নতির সুসংবাদ দান কর। তবে যে ব্যক্তি দ্বীনের কোন কাজ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করিবে আখেরাতে তাহার কোন অংশ নাই। (তারগীব)

এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, আমি সর্বোত্তম অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার যিয়ারত লাভ করিয়াছি। আমার প্রতি এরশাদ হইয়াছে যে, হে মুহাম্মদ! মালায়ে

আলা অর্থাৎ ফেরেশতারা কোন্ বিষয় লইয়া পরস্পর মতভেদ করিতেছে? আমি আরজ করিলাম, আমার তো জানা নাই। তখন আল্লাহ পাক আপন কুদরতী হাত আমার বুকের উপর রাখিয়া দিলেন। যাহার শীতলতা আমার বুকের ভিতর পর্যন্ত অনুভব করিলাম। ইহার বরকতে সমগ্র সৃষ্টিজগত আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। আমাকে আবার প্রশ্ন করা হইল, এখন বলুন, ফেরেশতারা কোন্ বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করিতেছে? আমি আরজ করিলাম, যে সব জিনিস মানুষের মর্যাদা বুলন্দ করে এবং যে সব জিনিস মানুষের গোনাহের কাফ্ফারা হয় আর জামাতে নামায পড়ার জন্য যে কদম উঠে, উহার সওয়াব সম্পর্কে, শীতের সময় উত্তমরূপে ওযু করার ফযীলত এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকার ফযীলত সম্পর্কে। যে ব্যক্তি এইসব জিনিসের এহতেমাম করিবে, উত্তম হালতে জিন্দেগী কাটাইবে এবং উত্তম হালতে তাহার মৃত্যু হইবে।

বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ হে আদমসন্তান! তুমি দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকআত নামায পড়িয়া লও, তোমার সারাদিনের যাবতীয় কাজ আমি সমাধা করিয়া দিব।

'তাম্বীহুল-গাফেলীন' কিতাবে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, নামায আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ, ফেরেশতাদের প্রিয় বস্তু, আম্বিয়ায়ে কেরামের আদর্শ। ইহা দ্বারা মারেফাতের নূর পয়দা হয়, দোয়া কবূল হয়, রিযিকে বরকত হয়। ইহা ঈমানের মূল, শরীরের আরাম, দুশমনের বিরুদ্ধে অস্ত্র, নামাযীর জন্য সুপারিশকারী, কবরের চেরাগ ও উহার নির্জনতায় মনোরঞ্জনকারী, মুনকার-নকীরের প্রশ্নের উত্তর, কেয়ামতের প্রচণ্ড রৌদ্রে ছায়া, অন্ধকারে আলো, জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক, আমলের পাল্লার ওজন, দ্রুত পুলসেরাত পার করিয়া দেয়, জান্নাতের চাবি।

হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) 'মুনাব্বিহাত' কিতাবে হযরত উসমান গণী (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাবন্দি সহকারে সঠিক সময়ে নামাযের এহতেমাম করে, আল্লাহ তায়ালা নয়টি পুরস্কারের দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করেন। (১) আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাহাকে ভালবাসেন। (২) তাহাকে সুস্থতা দান করেন। (৩) ফেরেশতাগণ তাহার হেফাজত করেন। (৪) তাহার ঘরে বরকত দান করেন। (৫) তাহার চেহারায় বুযুর্গদের নূর ফুটিয়া উঠে। (৬) তাহার দিল নরম করিয়া দেন। (৭) পুলসিরাতের উপর দিয়া সে বিজলীর মত দ্রুত পার হইয়া যাইবে।

(৮) তাহাকে জাহান্নাম হইতে নাজাত দিয়া দেন। (৯) জান্নাতে এমন লোকদের প্রতিবেশী হিসাবে সে স্থান পাইবে, যাহাদের সম্পর্কে কুরআনে এই সুসংবাদ আসিয়াছে ঃ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন না তাহাদের কোন ভয়ভীতি থাকিবে আর না তাহাদের কোন প্রকার চিন্তা থাকিবে। (সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ৬২)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, নামায দ্বীনের খুঁটি এবং ইহার মধ্যে দশ প্রকার উপকারিতা রহিয়াছে ঃ (১) নামায চেহারার উজ্জ্বলতা (২) দিলের নূর (৩) শরীরের আরাম ও সুস্বাস্থ্যের কারণ (৪) কবরের সঙ্গী (৫) আল্লাহর রহমত নাযিলের ওসীলা (৬) আসমানের চাবি (৭) নেক আমলের পাল্লা ভারী হওয়ার বস্তু (উহা দ্বারা নেক আমলের পাল্লা ভারী হইয়া যায়) (৮) আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ (৯) বেহেশতের মূল্য (১০) দোযখের প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করিল সে দ্বীনকে কায়েম রাখিল আর যে নামায ত্যাগ করিল সে নিজের দ্বীনকে ধ্বংস করিল। (মুনাব্বিহাতে ইবনে হজর)

এক হাদীস বর্ণিত আছে, ঘরে নামায পড়া নূর স্বরূপ, সুতরাং তোমরা (নফল) নামায পড়িয়া নিজেদের ঘরগুলিকে উজ্জ্বল কর। (জামে সগীর) আর এই হাদীস তো খুবই প্রসিদ্ধ যে, আমার উম্মত কিয়ামতের দিন ওযূ ও সেজদার দরুন উজ্জ্বল হাত পা এবং উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী হইবে এবং এই আলামত দ্বারাই তাহাদিগকে অন্যান্য উম্মত হইতে চিনা যাইবে।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন আসমান হইতে কোন বালা-মুসীবত নাযিল হয় তখন মসজিদ আবাদকারীদের হইতে উহা সরাইয়া লওয়া হয়। (জামে সগীর) বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা সিজদার নিশানীকে জাহান্নামের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন, সে উহা জ্বালাইতে পারিবে না। (অর্থাৎ নিজের বদ-আমলীর কারণে যদি সে জাহান্নামে প্রবেশ করেও, তবু যে জায়গায় সিজদার চিহ্ন থাকিবে সেই জায়গায় আগুন কোন আছর করিতে পারিবে না।)

এক হাদীসে আছে যে, নামায শয়তানের মুখ কালো করিয়া দেয় এবং দান-খয়রাত শয়তানের কোমর ভাঙ্গিয়া দেয়। (জামে সগীর) এক রেওয়ায়াতে এরশাদ হইয়াছে যে, নামায (রোগের জন্য) শেফা।

(জামে সগীর)

অন্য এক রেওয়ায়াতে এই সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) একবার পেটের উপর ভর করিয়া

শুইয়া ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পেটে কি ব্যথা হইতেছে? হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, জ্বি হাঁ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, উঠ, নামায পড়। নামাযের মধ্যে শেফা রহিয়াছে।

(ইবনে কাসীর)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার স্বপ্নযোগে বেহেশত দেখিলেন। সেখানে তিনি হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর জুতা ঘষিয়া চলার আওয়াজও শুনিতে পাইলেন। সকাল বেলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেই বিশেষ আমল কি, যাহার বদৌলতে জান্নাতেও তুমি (দুনিয়ার ন্যায়) আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিলে? তিনি আরজ করিলেন, দিবা--রাত্রি যখনই আমার ওযূ নষ্ট হয় তখনই ওযূ করিয়া লই এবং যে কয় রাকআত তৌফীক হয় তাহিয়্যাতুল ওযূ নামায পড়িয়া লই। (ফাতহুল বারী) হযরত সাফীরী (রহঃ) বলিয়াছেন, ফজরের নামায ত্যাগকারীকে ফেরেশতাগণ হে ফাজের (বদ্‌কার), যোহরের নামায ত্যাগকারীকে হে খাছের (ক্ষতিগ্রস্ত), আছরের নামায ত্যাগকারীকে হে আছী (না-ফরমান), মাগরিবের নামায ত্যাগকারীকে হে কাফের এবং এশার নামায ত্যাগকারীকে হে মুজীই' (আল্লাহর হক বিনষ্টকারী) বলিয়া ডাকিয়া থাকেন।(গালিয়াতুল-মাওয়ায়েজ)

আল্লামা শারানী (রহঃ) বলেন, এই কথা বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, বালা-মুসীবত এমন সব বসতি হইতে হটাইয়া দেওয়া হয় যেখানকার লোকজন নামাযী। পক্ষান্তরে যে সকল বসতির লোক নামাযী নহে সেই সব স্থানে বালা-মুসীবত নাযিল হয়। এইরূপ এলাকায় ভূমিকম্প বা বজ্রপাত হওয়া কিংবা বাড়ীঘর ধসিয়া পড়া মোটেই অসম্ভব নয়। কেহ যেন এই ধারণা না করে যে, 'আমি তো নামাযী, অন্যদের ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নাই।' বালা-মুসীবত যখন নাযিল হয় তখন তাহা ব্যাপক হইয়া থাকে। স্বয়ং হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মধ্যে নেককার লোক মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হইতে পারি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হাঁ যখন খারাবী অধিক হইয়া যায়। কেননা, সামর্থ্য অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা তাহাদের জন্যও জরুরী ছিল।

(৮) رُوِیَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ حَتّٰى مَضٰى

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کردے گو وہ بعد میں پڑھ

وَقْتِهَا ثُمَّ قَضٰى عُـذِّبَ فِي النَّارِ
حُقُبًا وَالْحُقُبُ ثَمَانُوْنَ سَـنَةً
وَالسَّنَةُ ثَلٰثُمِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ يَوْمًا
كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ
سَـنَةٍ۔

بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ
سے ایک حُقُب جہنّم میں جلے گا اور حُقُب کی
مقدار اَسّی ۸۰ برس کی ہوتی ہے اور ایک برس
تین سو ساٹھ دن کا اور قیامت کا ایک دن
ایک ہزار برس کے برابر ہو گا (اس حساب سے
ایک حُقُب کی مقدار دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس ہوتی ...... ۲۸۸)

(کذا فی مجالس الابرار قلت لم اجده فیما عندی من کتب الحدیث الا ان
مجالس الابرار مدحه شیخ مشائخنا الشاه عبد العزیز الدهلویؒ ثم قال الراغب
فی قوله تعالیٰ لابثین فیها احقابا قیل جمع الحقب ای الدهر قیل والحقبة ثمانون
عامًا والصحیح ان الحقبة مدة من الزمان مبهمة واخرج ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالیٰ
فویل للمصلین الذین هم عن صلوٰتهم ساهون عن ابن عباس ان فی جهنم لوادیا
تستعیذ جهنم من ذلك الوادی فی کل یوم اربعمائة مرة اعد ذلك الوادی للمرائین
من امة محمد الحدیث وذکر ابو اللیث السمرقندی فی قرة العیون عن ابن عباس وهو
مسکن من یؤخر الصلوٰة عن وقتها وعن سعد بن ابی وقاص مرفوعا الذین هم عن
صلوٰتهم ساهون قال هم الذین یؤخرون الصلوٰة عن وقتها وصحح الحاکم والبیهقی
وقفه واخرج الحاکم عن عبد الله فی قوله تعالیٰ فسوف یلقون غیا قال واد فی جهنم بعید
القعر خبیث الطعم وقال صحیح الاسناد.)

(৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নামায কাজা করে, যদিও পরে উহা পড়িয়া নেয়। তথাপি সময়মত নামায না পড়ার কারণে সে এক হোকবা পরিমাণ জাহান্নামে জ্বলিবে। আশি বৎসরে এক হোকবা হয়। আর এক বৎসর তিনশত ষাট দিনে আর কিয়ামতের একদিন এক হাজার বছরের সমান হইবে। এই হিসাবে এক হোকবার পরিমাণ হইল দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বৎসর।

(মাজালিসুল-আবরার)

ফায়দা ঃ আভিধানিক অর্থে হোকবা হইল দীর্ঘ মেয়াদী সময়। অধিকাংশ হাদীসে উহার পরিমাণ উল্লেখিত সংখ্যাই আসিয়াছে। দুররে মানছুর কিতাবেও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আলী (রাযিঃ) বেলাল হাজরী (রহঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি

বলিয়াছেন, আশি বৎসরে এক হোকবা। প্রতি বৎসরে বার মাস। প্রতি মাসে ত্রিশ দিন। আর প্রতিদিনে এক হাজার বৎসরের সমান।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে সহীহ রেওয়ায়াত মোতাবেক আশি বৎসর বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) খোদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও ইহা নকল করিয়াছেন যে, আশি বৎসরে এক হোকবা, তিনশত ষাট দিনে এক বৎসর এবং একদিন তোমাদের এই জগতের হিসাবে এক হাজার দিনের সমান হয়। এই একই হিসাব হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন যে, কাহারও এই ভরসায় থাকা উচিত নয় যে, ঈমানের বদৌলতে শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম হইতে বাহির হইবই। কারণ দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বৎসর কোন সাধারণ কথা নয় ; তাহাও যদি আরও অধিক পরিমাণ সময় দোযখে থাকার মত অন্য কোন অপরাধ না থাকে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে কিছু কমবেশী সময়েরও উল্লেখ আসিয়াছে। কিন্তু প্রথমতঃ উপরে লিখিত পরিমাণটির কথা কয়েকটি হাদীসে আসিয়াছে, এইজন্য ইহাই প্রাধান্য রাখে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও সম্ভব যে, বিভিন্ন লোকের অবস্থার প্রেক্ষিতে কমবেশী হইতে পারে।

আবূ লাইস সমরকন্দী (রহঃ) 'কুররাতুল উয়ূন' গ্রন্থে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া এক ওয়াক্ত নামায ছাড়িয়া দেয় তাহার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাকে উহাতে অবশ্যই প্রবেশ করিতে হইবে। আবু লাইস সমরকন্দী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন ঃ তোমরা এই দোয়া কর হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে কাহাকেও তুমি হতভাগ্য বঞ্চিত করিও না। অতঃপর নিজেই প্রশ্ন করিলেন, তোমরা কি জান হতভাগ্য বঞ্চিত কে? সাহাবীগণ জানিতে চাহিলে তিনি এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দেয় সেই হতভাগ্য বঞ্চিত। ইসলামে তাহার কোন অংশ নাই।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া বিনা ওজরে নামায ত্যাগ করিবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিবেন না এবং তাহাকে 'আজাবুন আলীম' অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, দশ ব্যক্তি বিশেষভাবে শাস্তি ভোগ করিবে। তন্মধ্যে একজন হইল নামায ত্যাগকারী,

তাহার হাত বাঁধা থাকিবে এবং ফেরেশতাগণ তাহার মুখে ও পিঠে আঘাত করিতে থাকিবে। জান্নাত বলিবে, আমার এবং তোমার মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই ; না আমি তোমার জন্য, না তুমি আমার জন্য। দোযখ বলিবে, আস, আমার নিকট আস। তুমি আমার জন্য, আমিও তোমার জন্য।

আরও বর্ণিত আছে, জাহান্নামে একটি ময়দান আছে, যাহার নাম লমলম। উহাতে উটের ঘাড়ের মত মোটা মোটা সাপ রহিয়াছে, উহাদের দৈর্ঘ্য এক মাসের পথের সমান। উহাতে নামায ত্যাগকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হইবে। অন্য এক হাদীসে আছে জাহান্নামে 'জুববুল হাযান' নামক একটি ময়দান রহিয়াছে, উহা বিচ্ছুদের আবাসস্থল। একেকটি বিচ্ছু খচ্চরের মত বড় হইবে। উহারাও নামায ত্যাগকারীদেরকে দংশন করিবে। হাঁ, মাওলায়ে কারীম যদি মাফ করিয়া দেন, তবে কাহার কি বলার আছে। কিন্তু মাফ তো চাহিতে হইবে।

ইবনে হজর (রহঃ) 'যাওয়াজির' কিতাবে লিখিয়াছেন, একজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার ভাই দাফনের কাজে শরীক ছিল। ঘটনাক্রমে দাফনের সময় তাহার টাকার থলি কবরে পড়িয়া যায়। তখন খেয়াল হয় নাই। কিন্তু পরে যখন খেয়াল হইল তখন তাহার খুব আফসোস হইল। চুপে চুপে কবর খুলিয়া উহা বাহির করিতে এরাদা করিল। অতঃপর যখন কবর খুলিল তখন কবর আগুনে পরিপূর্ণ ছিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট আসিল এবং অবস্থা বর্ণনা করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মা বলিলেন, সে নামাযে অলসতা করিত এবং কাজা করিয়া দিত। (আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন)

(৯) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَاسَهْمَ فِی الْاِسْلَامِ لِمَنْ لَّا صَلٰوةَ لَهٗ وَلَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَّا وُضُوْءَ لَهٗ .

حضور اقدسؐ کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اُس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے. نماز دین کے لئے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کیلئے سر ہوتا ہے.

(اخرجه البزار واخرج الحاكم عن عائشةؓ مرفوعًا وصححه ثلث احلف عليهن لايجعل الله من له سهم فى الاسلام كمن لا سهم له وسهام الاسلام الصوم والصلوٰة والصدقة الحديث واخرج الطبرانى فى الاوسط عن ابن عمر مرفوعًا لادين لمن لاصلوٰة له انما موضع الصلوٰة من الدين كموضع الراس من الجسد كذا فى الدر المنثور)

(৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, ইসলামে তাহার কোন অংশ নাই। আর বিনা ওযূতে নামায হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে, নামায ব্যতীত দ্বীন হয় না। নামায দ্বীনের জন্য এমন, যেমন মানুষের শরীরের জন্য মাথা।

ফায়দা ঃ যে সমস্ত লোক নামায না পড়িয়াও নিজেদেরকে মুসলমান বলে কিংবা ইসলামী জযবার লম্বা-চওড়া দাবী করিয়া থাকে, তাহারা যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সমস্ত পবিত্র বাণীর মধ্যে একটু চিন্তা-ফিকির করে। আর যাহারা পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের মত সাফল্য অর্জনের স্বপ্ন দেখে তাহারা যেন ঐ সকল বুযুর্গদের অবস্থাও যাচাই করিয়া দেখে যে, দ্বীনকে তাহারা কত মজবুতির সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। অতএব, দুনিয়া তাহাদের পদচুম্বন কেন করিবে না?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর চোখে পানি জমিয়া গিয়াছিল। লোকেরা আরজ করিল, ইহার চিকিৎসা তো হইতে পারে, তবে কয়েক দিন আপনি নামায পড়িতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন, ইহা হইতে পারে না ; আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, সে আল্লাহর তায়ালার দরবারে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে যে, লোকেরা বলিল, আপনাকে পাঁচ দিন কাঠের উপর সেজদা করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, এইভাবে আমি এক রাকআত নামাযও পড়িব না। জীবনভর অন্ধ থাকার উপর ছবর করিয়া যাওয়া তাহাদের নিকট নামায তরক করা হইতে সহজ ছিল। অথচ এরূপ ওজরবশতঃ নামায ছাড়িয়া দেওয়া জায়েযও ছিল।

হযরত ওমর (রাযিঃ) শেষ সময়ে যখন বর্শা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন, তখন সব সময়ই তাহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত জারী থাকিত এবং অধিকাংশ সময়ই তিনি একেবারে বেখবর অবস্থায় থাকিতেন, এমনকি এই অবস্থায় তাঁহার ওফাতও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই দিনগুলিতে যখন নামাযের সময় হইয়া যাইত তখন তাহাকে নামাযের কথা স্মরণ করাইয়া নামায পড়ার জন্য দরখাস্ত করা হইত। তিনি এই অবস্থাতেই নামায আদায় করিতেন এবং বলিতেন, হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই। যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, ইসলামে তাহার কোন অংশ নাই। অথচ আমাদের নিকট অসুস্থ ব্যক্তির আরাম ও মঙ্গল কামনা ইহার মধ্যেই মনে করা হয় যে, তাহাকে নামাযের জন্য কষ্ট না দেওয়া হউক ; পরে ফিদিয়া দিয়া

দেওয়া যাইবে। বস্তুতঃ ঐসব মহান ব্যক্তিদের নিকট রোগীর প্রতি দরদ ইহাকেই মনে করা হইত যে, মওতের মুখেও যদি এবাদত করা সম্ভব হয় তবু উহাতে বাধা না দেওয়া হউক।

ببین تفاوتِ راه از کجا است تا به کجا.

দেখ, উভয় রাস্তার মাঝে কত ব্যবধান—কত পার্থক্য !

হযরত আলী (রাযিঃ) একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া কাজকর্মে সাহায্যের জন্য একজন খাদেম চাহিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এই তিনজন গোলামের মধ্যে যাহাকে তোমার পছন্দ হয় লইয়া যাও। হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনিই পছন্দ করিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে দিয়া বলিলেন, ইহাকে লইয়া যাও, সে নামাযী। কিন্তু ইহাকে মারধর করিও না। কেননা, নামাযীকে মারধর করিতে আমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা একজন সাহাবী হযরত আবুল হাইছাম (রাযিঃ)এর সাথেও ঘটিয়াছিল। তিনিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোলামের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগে আমাদের কাজের লোক বা কর্মচারী যদি নামাযী হয় তবে আমরা তাহাকে তিরস্কার করি এবং নিজের নির্বুদ্ধিতার দরুন তাহার নামাযের দ্বারা আমাদের কাজে ক্ষতি হইতেছে মনে করিয়া থাকি।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ)এর উপর একবার আধ্যাত্মিক বিশেষ অবস্থা প্রবল হইয়াছিল। এই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সাত দিন পর্যন্ত তিনি ঘরে ছিলেন, ঘুম ও খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মুরশিদকে এই বিষয়ে জানানো হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নামায ঠিকমত আদায় করিতেছে কি না? লোকেরা বলিল, জ্বি হাঁ, নামাযে ত্রুটি নাই। ইহাতে মুরশিদ বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি শয়তানকে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়
জামাতের বর্ণনা

কিতাবের শুরুতে লেখা হইয়াছে যে, এমন অনেক ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাহারা নামায পড়িয়া থাকেন বটে কিন্তু জামাতে নামায পড়ার এহতেমাম করেন না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যেমন নামায পড়ার বিষয়ে কঠোরভাবে তাকীদ আসিয়াছে তেমনি জামাতের সহিত নামায পড়ার বিষয়েও অনেক তাকীদ বর্ণিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে দুইটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদ জামাতের ফযীলত সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জামাত তরক করার শাস্তি সম্পর্কে।

প্রথম পরিচ্ছেদ
জামাতের ফযীলত

(١) عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوۃ الجماعۃ افضل من صلوۃ الفذ بسبع وعشرین درجۃ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے ستائیس درجہ زیادہ ہوتی ہے۔

(رواہ مالک والبخاری ومسلم والترمذی والنسائی کذا فی الترغیب)

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, জামাতের নামায একা নামায হইতে সাতাইশ গুণ বেশী মর্তবা রাখে।

(তারগীব ঃ বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ মানুষ যখন নামায পড়ে এবং সওয়াবের নিয়তেই পড়িয়া থাকে, তখন ইহা একটি মামুলী ব্যাপার যে ঘরে না পড়িয়া মসজিদে যাইয়া জামাতের সহিত পড়িয়া লইবে, ইহাতে না তেমন কোন কষ্ট হয় আর না কোন অসুবিধা হয়। অথচ এত অধিক পরিমাণ সওয়াব লাভ হইয়া থাকে ; কে আছে এমন যে, এক টাকার পরিবর্তে সাতাইশ বা আটাইশ টাকা পাইয়াও উহাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে এত বড় লাভের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। ইহার কারণ এ ছাড়া আর কি হইতে পারে যে, দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের কোন পরওয়া নাই। আমাদের দৃষ্টিতে দ্বীনের লাভ যেন কোন লাভই নয়। দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের

ক্ষেত্রে টাকায় এক আনা, দুই আনা লাভের জন্য আমরা দিনভর মাথার ঘাম পায়ে ফেলি আর আখেরাতের ব্যবসা যেখানে সাতাইশ গুণ লাভ রহিয়াছে উহাকে মুসীবত মনে করি। জামাতে নামাযের মধ্যে দোকানের ক্ষতি, বেচা-কেনার অসুবিধা, দোকান বন্ধ করার ঝামেলা ইত্যাদি ওজর আপত্তি পেশ করা হয়। কিন্তু যাহাদের দিলে আল্লাহ তায়ালার আজমত ও বড়ত্ব রহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর একীন রহিয়াছে এবং যাহাদের অন্তরে আজর ও সওয়াবের কোন প্রকার মূল্য রহিয়াছে, তাহাদের নিকট এইসব অহেতুক আপত্তির কোনই মূল্য নাই। এইরূপ লোকদেরই আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে প্রশংসা করিয়াছেন ঃ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ অর্থাৎ 'তাহারা এমন ব্যক্তি যে, ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদিগকে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিতে পারে না।' (সূরা নূর, আয়াত ঃ ৩৭) আযানের পর সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন আপন ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত কি আচরণ করিতেন তাহা হেকায়াতে সাহাবা কিতাবের পঞ্চম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

সালেম হাদ্দাদ (রহঃ) একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি তেজারত করিতেন। আযানের আওয়াজ শুনামাত্রই তাহার চেহারা বিবর্ণ ও হলুদ হইয়া যাইত। তিনি অস্থির হইয়া দোকান খোলা রাখিয়াই দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং এই কবিতাগুলি পাঠ করিতেন ঃ

إِذَا مَا دَعَا دَاعِيكُمْ قُمْتُ مُسْرِعًا　　مُجِيبًا لِّمَوْلَى جَلَّ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ

যখন তোমাদের মুআয্‌যিন আযান দিবার জন্য দাঁড়ায়, তখন আমি ঐ মহান মালিকের দিকে দ্রুত সাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া যাই, যাহার শান ও বড়ত্বের কোন তুলনা নাই।

أُجِيبُ إِذَا نَادَى بِسَمْعٍ وَّطَاعَةٍ　　وَبِي نَشْوَةٌ لَبَّيْكَ يَا مَنْ لَّهُ الْفَضْلُ

যখন মুআয্‌যিন আহবান করেন, তখন আমি আনন্দের সহিত পরম আবেগ ও আনুগত্য সহকারে উত্তর দেই, হে মহান করুণাময়! লাব্বাইক; আমি হাজির।

وَيَصْفَرُّ لَوْنِي خِيفَةً وَّمَهَابَةً　　وَيَرْجِعُ لِي عَنْ كُلِّ شُغْلٍ بِهِ شُغْلُ

ভয় ও আতংকে আমার রং হলুদ বর্ণ হইয়া যায় এবং সেই পবিত্র সত্তার ধ্যান আমাকে সকল কাজ হইতে বেখবর করিয়া দেয়।

وَحَقِّكُمْ مَا لَذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ　　وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي قَطُّ لَا يَحْلُو

তোমার হকের কসম, তোমার যিকির ব্যতীত কোন কিছুতেই আমি স্বাদ পাই না এবং তোমা ব্যতীত অন্য কাহারও যিকিরে আমি মজা পাই না।

مَتَى يَجْمَعُ الْأَيَّامُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ　　وَيَفْرَحُ مُشْتَاقٌ إِذَا جَمَعَ الشَّمْلُ

জানিনা, যমানা কখন তোমার সহিত আমার মিলন ঘটাইবে। আর আশেক তো তখনই আনন্দিত হয় যখন মিলন ভাগ্যে জুটে।

فَمَنْ شَاهَدَتْ عَيْنَاهُ نُورَ جَمَالِكُمْ　　يَمُوتُ اشْتِيَاقًا نَحْوَكُمْ قَطُّ لَا يَسْلُو

যাহার দুইটি চোখ তোমার জামালের নূর দেখিয়াছে, সে তোমার মিলনের আগ্রহে মৃত্যবরণ করিবে, কখনও সে সান্ত্বনা পাইবে না।

(নুযহাতুল-মাজালিস)

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, যাহারা বেশী সময় মসজিদে অবস্থান করে, তাহারা মসজিদের খুঁটিস্বরূপ। ফেরেশতাগণ তাহাদের সঙ্গী হইয়া থাকেন। তাহারা অসুস্থ হইলে ফেরেশতাগণ তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। তাহারা কোন কাজে গেলে ফেরেশতাগণ তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন।

(হাকিম)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَضْعَفُ عَلٰى صَلٰوتِهٖ فِي بَيْتِهٖ وَفِي سُوْقِهٖ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَّذٰلِكَ أَنَّهٗ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهٗ إِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَّحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَإِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلٰٓئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو پچیس ۲۵ درجہ المضاعف ہوتی ہے اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادہ سے چلتا ہے کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لئے مغفرت

لَا يَزَالُ فِيْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلٰوةَ.
(رواه البخاری واللفظ له ومسلم
وابوداؤد والترمذی وابن ماجة
كذا فی الترغیب)

اور رحمت کی دُعا کرتے رہتے ہیں اور جبتک
آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا
ثواب پاتا رہتا ہے۔

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কোন ব্যক্তির ঐ নামায যাহা জামাতের সহিত পড়া হইয়াছে উহা ঘরে বা বাজারে একাকী পড়া নামায হইতে পঁচিশ বার দ্বিগুণ সওয়াব রাখে। কেননা, কোন ব্যক্তি যখন উত্তমরূপে ওযু করে, অতঃপর মসজিদের দিকে একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই গমন করে, অন্য কোন উদ্দেশ্য তাহার না থাকে তখন তাহার প্রতি কদমে একটি করিয়া নেকী বাড়িয়া যায় এবং একটি করিয়া গোনাহ মাফ হইয়া যায়। অতঃপর যখন নামায পড়িয়া ঐ স্থানে বসিয়া থাকে, যতক্ষণ সে ওযুর সহিত বসিয়া থাকে ফেরেশতাগণ তাহার জন্য মাগফেরাত ও রহমতের দোয়া করিতে থাকেন। আর যতক্ষণ কেহ নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে ততক্ষণ সে নামাযের সওয়াব পাইতে থাকে। (তারগীব ঃ বুখারী)

ফায়দা ঃ প্রথম হাদীসে সাতাইশ গুণ বেশী এবং এই হাদীসে পঁচিশ গুণ বেশী সওয়াবের কথা বলা হইয়াছে। দুই হাদীসের পার্থক্যের বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম অনেক উত্তর প্রদান করিয়াছেন যাহা হাদীসের ব্যাখ্যার কিতাবসমূহে উল্লেখিত আছে। তন্মধ্য হইতে একটি এই যে, ইহা নামাযীদের অবস্থার পার্থক্যের কারণেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ কেহ পঁচিশ গুণ সওয়াব পায় আর কেহ এখলাসের দরুণ সাতাইশ গুণ পায়। কোন কোন আলেমের মতে যেসমস্ত নামাযে কেরাত আস্তে পড়া হয় উহাতে পঁচিশ গুণ আর যে সমস্ত নামাযে কেরাত উচ্চস্বরে পড়া হয় উহাতে সাতাইশ গুণ সওয়াব হয়। আবার কেহ কেহ এশা ও ফজরের জন্য সাতাইশ গুণ বলিয়াছেন। কেননা, এই দুই সময়ে নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়া কষ্টকর মনে হয়। আর পঁচিশগুণ বলিয়াছেন বাকী তিন ওয়াক্তের জন্য। কোন কোন ব্যাখ্যাদানকারী লিখিয়াছেন, এই উম্মতের উপর সর্বদা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের বৃষ্টি বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, যেমন অনেক ক্ষেত্রেই ইহার প্রকাশ ঘটিয়াছে। কাজেই প্রথমে পঁচিশ গুণ ছিল পরে উহা বাড়িয়া সাতাইশ গুণ হইয়াছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার এক চমৎকার কথা লিখিয়াছেন। তাহারা লিখিয়াছেন যে, এই হাদীসে বর্ণিত

সওয়াব প্রথম হাদীসে বর্ণিত সওয়াব হইতে অনেক বেশী। কেননা, এই হাদীসে পঁচিশগুণ বেশী হওয়ার কথা এরশাদ হয় নাই বরং পঁচিশ বার দ্বিগুণ সওয়াবের কথা এরশাদ করা হইয়াছে। অর্থাৎ পঁচিশ বার পর্যন্ত দ্বিগুণ সওয়াব হইতে থাকে। এই হিসাবে জামাতের সহিত এক নামাযের সওয়াব তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারিশত বত্রিশ (৩,৩৫,৫৪,৪৩২) গুণ হয়। আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতের কাছে এই সওয়াব কিছুমাত্রও অসম্ভব নয়। আর যেহেতু নামায ত্যাগ করার গোনাহ এক হোকবা, যাহার পরিমাণ উপরে বর্ণিত হইয়াছে, কাজেই সেই অনুপাতে নামাযের সওয়াবও এতবেশী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইদিকে ইশারা করিয়াছেন যে, ইহা তো নিজেরই চিন্তা করার বিষয় যে, জামাতের নামাযে কি পরিমাণ সওয়াব রহিয়াছে এবং কতভাবে নেকী বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘর হইতে ওযূ করিয়া শুধুমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে রওয়ানা হয়, তাহার প্রতি কদমে একটি করিয়া নেকী বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর একটি করিয়া গোনাহ মাফ হইতে থাকে।

মদীনা শরীফে বনু সালামা নামে একটি গোত্র ছিল। তাহাদের ঘর-বাড়ী মসজিদ হইতে দূরে ছিল। তাহারা মসজিদের নিকটবর্তী কোন স্থানে আসিয়া বসবাস করিতে ইচ্ছা করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা সেখানেই থাক। তোমাদের মসজিদে আসার প্রতিটি কদম লিখা হয়।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ঘর হইতে ওযু করিয়া নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, সে যেন এহরাম বাঁধিয়া হজ্জের জন্য রওয়ানা হইল। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও একটি ফযীলতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, নামায শেষ করিবার পর যতক্ষণ নামাযের স্থানে বসিয়া থাকে ফেরেশতারা ততক্ষণ পর্যন্ত গোনাহ মাফ ও রহমতের জন্য দোয়া করিতে থাকে। ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা, কাজেই তাহাদের দোয়ার বরকত স্পষ্ট বিষয়।

মুহাম্মদ ইবনে সামাআহ (রহঃ) একজন বুযুর্গ আলেম ছিলেন। তিনি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর শাগরেদ ছিলেন। একশত তিন বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ঐ সময় তিনি দৈনিক দুইশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। তিনি বলেন, একাধারে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত শুধুমাত্র একবার ব্যতীত কখনও আমার তকবীরে উলা ছুটে নাই। যেদিন আমার মায়ের ইন্তেকাল হয় সেদিন ব্যস্ততার কারণে আমার

তকবীরে উলা ছুটিয়া গিয়াছিল। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, একবার আমার জামাতের নামায ছুটিয়া গিয়াছিল। যেহেতু জামাতের নামাযের সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী হয়, সেহেতু ঐ নামাযকে পঁচিশবার পড়িলাম, যাহাতে ঐ সংখ্যা পূর্ণ হইয়া যায়। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, একব্যক্তি আমাকে বলিতেছে ; "হে মুহাম্মদ! পঁচিশবার নামায তো তুমি পড়িয়া নিলে কিন্তু ফেরেশতাদের আমীনের কি হইবে?" (ফাওয়ায়েদে বাহিয়্যাহ)

ফেরেশতাদের আমীনের অর্থ এই যে, বহু হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, ইমাম যখন সূরা ফাতেহার পর আমীন বলে, তখন ফেরেশতারাও আমীন বলে। যে ব্যক্তির আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সহিত একত্রে হয়, তাহার অতীতের সকল গোনাহ মাফ হইয়া যায়। উপরোক্ত স্বপ্নের মধ্যে এই হাদীসের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেব (রহঃ) বলিয়াছেন যে, এই ঘটনার মধ্যে এই কথা বুঝানো হইয়াছে যে, সম্মিলিতভাবে জামাতের নামাযে যে ছওয়াব হাসিল হয়, উহা একাকী নামায পড়িলে কিছুতেই হাসিল হইতে পারে না ; যদিও এই নামাযকে এক হাজার বার পড়ে। আর এই কথা তো সহজেই বুঝে আসে যে, জামাতে নামায পড়ার মধ্যে শুধু ফেরেশতাদের সাথে আমীনের ফযীলতই নহে, বরং জামাতে শরীক হওয়া. নামায শেষে ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়াও রহিয়াছে যাহা এই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, এই সব ফযীলত ছাড়াও আরও অনেক বিষয় রহিয়াছে, যাহা একমাত্র জামাতের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। আবার একটি জরুরী বিষয় ইহাও খেয়াল রাখিতে হইবে যে, ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন ঃ ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়ার উপযুক্ত তখনই হইবে যখন নামায সত্যিকারের নামায হইবে, পুরান কাপড়ের ন্যায় পেঁচাইয়া মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া দেওয়ার মত যদি নামায হয়, তবে উহা ফেরেশতাদের দোয়ার উপযুক্ত হইবে না। (বাহ্‌জাহ্‌)

(৩) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جلّ شانہٗ کی بارگاہ میں مسلمان بنکر حاضر ہو وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنیکا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے (یعنی مسجد میں) اسلئے کہ حق تعالیٰ شانہٗ نے تمہارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے ایسی سنتیں

صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّىْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِىْ بَيْتِهٖ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَّجُلٍ يَّتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَّخْطُوْهَا حَسَنَةً وَّيَرْفَعُهٗ بِهَا دَرَجَةً وَّيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَّعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهٖ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ وفى رواية لَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلٰوةِ اِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهٗ اَوْ مَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَمْشِىْ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يَاْتِىَ الصَّلٰوةَ۔

جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں انہیں میں سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت کے چھوڑنے والے ہو گے اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتے گی اور ایک ایک خطا معاف ہو گی اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہو وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا ورنہ حضورؐ کے زمانہ میں عام منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی یا کوئی سخت بیمار، ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے گھسٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔

وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلٰوةَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ (رواه مسلم وابوداؤد والنسائى وابن ماجة كذا فى الترغيب و الدر المنثور والسنة نوعان سنة الهدى وتاركها يستوجب اساءة كالجماعة والاذان والزوائد وتاركها لايستوجب اساءة كسير النبى صلى الله عليه وسلم فى لباسه وقعوده كذا فى نور الانوار والاضافة فى سنة الهدى بيانية اى سنة هى هدى والحمل مبالغة كذا فى قمر الاقمار)

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার দরবারে মুসলমানরূপে হাজির হইতে চায়, সে যেন এই নামাযসমূহকে এমন স্থানে আদায় করার এহতেমাম

করে যেখানে আযান হয় (অর্থাৎ মসজিদে)। কেননা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবী আলাইহিস-সালামের জন্য এমন সুন্নতসমূহ জারী করিয়াছেন, যেইগুলি সম্পূর্ণই হেদায়েত। এই সমস্ত সুন্নতের মধ্যে জামাতের সহিত নামায আদায় করাও রহিয়াছে। যদি অমুক ব্যক্তির ন্যায় তোমরাও ঘরে নামায পড়িতে আরম্ভ কর, তবে তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ত্যাগকারী হইবে। আর ইহা জানিয়া রাখ যে, যদি তোমরা নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে ত্যাগ কর, তবে গোমরাহ হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে এবং মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়, তাহার প্রতি কদমে একটি করিয়া নেকী লেখা হইবে এবং একটি করিয়া গোনাহ মাফ করা হইবে। (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়) আমরা নিজেদের অবস্থা এরূপ দেখিতাম—যে-ব্যক্তি খোলাখুলি মুনাফেক, সে-ই কেবল জামাতে শামিল হইত না। নতুবা সাধারণ মুনাফেকরাও জামাত ছাড়িয়া দেওয়ার সাহস করিত না। অথবা কাহারও কঠিন রোগ হইলে জামাতে হাজির হইতে পারিত না। অন্যথায় যে-ব্যক্তি দুইজনের উপর ভর করিয়া হেঁচড়াইয়া যাইতে পারিত, তাহাকেও জামাতের সহিত কাতারে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইত। (তারগীব ঃ মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ)

ফায়দা ঃ সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের নিকট জামাতের এত এহতেমাম ছিল যে, অসুস্থ অবস্থায়ও কোন রকমে জামাতে উপস্থিত হওয়ার শক্তি থাকিলে তাঁহারা অবশ্য জামাতে শরীক হইতেন। এমনকি দুইজন লোকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া হইলেও যদি যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলেও তাঁহারা জামাত ত্যাগ করিতেন না। আর কেনই বা এমন হইবে না—তাহাদের ও আমাদের মনিব নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এইরূপ এহ্‌তেমাম করিতেন। এইজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতকালের অসুস্থতার সময়ও ঠিক এইরূপ অবস্থাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। রোগ-যন্ত্রণায় বারবার বেহুঁশ হইয়া পড়িতেছিলেন, কয়েকবার ওযূর জন্য পানি চাহিলেন। অবশেষে একবার ওযূ করিলেন এবং হযরত আব্বাস (রাযিঃ) এবং অন্য একজন সাহাবীর সাহায্যে মসজিদে তশরীফ লইয়া গেলেন। তখন অবস্থা এই ছিল যে, ভালভাবে তাঁহার পা মোবারক মাটিতে জমাইয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারই নির্দেশে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নামায পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হুযূর (সাঃ) পৌঁছিয়া জামাতে শরীক হইলেন।

(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহর এবাদত করিবার সময় অন্তরে এইরূপ ধারণা করিবে যে, তিনি তোমার একেবারে সম্মুখে এবং তুমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছ। তুমি নিজেকে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মনে করিবে। (নিজেকে জীবিতদের মধ্যে মনেই করিবে না, তখন না কোন ব্যাপারে আনন্দ হইবে না দুঃখ।) মজলুমের বদদোয়া হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবে। যদি তুমি এতটুকু শক্তি রাখ যে, জমিনে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এশা ও ফজরের জামাতে হাজির হইতে পার, তবে ইহাতে অবহেলা করিবে না।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, এশা এবং ফজরের নামায মুনাফেকদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যদি তাহাদের জানা থাকিত যে, জামাতের সওয়াব কত বেশী, তাহা হইলে জমিনে হেঁচড়াইয়া হইলেও আসিয়া জামাতে শরীক হইত। (তারগীব)

(٤) عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چالیس دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اُولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو دو پروانے ملتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔

(رواه الترمذی وقال لااعلم احدا رفعه الامارویٰ مسلم بن قتیبة عن طعمة بن عمر وقال المملی ومسلم وطعمة وبقیة رواته ثقات کذا فی الترغیب قلت وله شواهد من حدیث عمرؓ رفعه من صلی فی مسجد جماعة اربعین لیلة لاتفوته الرکعة الاولیٰ من صلوٰة العشاء کتب الله له بها عتقا من النار رواه ابن ماجة واللفظ له والترمذی وقال نحو حدیث انس یعنی المتقدم ولم یذکر لفظه وقال مرسل یعنی ان عمارة الراوی عن انس لم یدرك انسا وعزاه فی منتخب الکنز الی البیهقی فی الشعب وابن عساکر وابن النجار)

(৪) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন এখলাসের সহিত এইভাবে নামায পড়ে যে, তাহার তকবীরে উলা ছুটে না তবে সে দুইটি পরওয়ানা লাভ করিবে—একটি

জাহান্নাম হইতে মুক্তির, দ্বিতীয়টি মুনাফেকী হইতে মুক্ত হওয়ার।

(তারগীব ঃ তিরমিযী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যে-ব্যক্তি এইভাবে চল্লিশ দিন এখলাসের সহিত নামায পড়ে যে, শুরু হইতে ইমামের সহিত শরীক হয় এবং ইমামের প্রথম তকবীর বলার সঙ্গে সঙ্গে সেও নামাযে শরীক হইয়া যায়। তবে সেই ব্যক্তি জাহান্নামে দাখেল হইবে না এবং মুনাফেকদের মধ্যেও গণ্য হইবে না। মুনাফেক তাহাদিগকে বলা হয়, যাহারা নিজেদেরকে প্রকাশ্যে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে কুফরী রাখে। আর বিশেষভাবে চল্লিশ দিনের কথা বলিবার জাহেরী কারণ হইল, অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে চল্লিশ দিনের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে—যেমন হাদীস শরীফে মানুষের জন্মের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, চল্লিশ দিন যাবত বীর্যরূপে অবস্থান করে, পরবর্তী চল্লিশ দিনে গোশতের টুকরার আকার ধারণ করে, এইরূপে প্রতি চল্লিশ দিনে উহার পরিবর্তন হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। এইজন্যই আল্লাহ ওয়ালাদের নিকটও চিল্লার একটা বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কতই না ভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক যাহাদের বৎসরের পর বৎসরও তকবীরে উলা ছুটে না।

(٥) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

نبئ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کیلئے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی تو بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔

(رواه ابوداؤد والنسائی والحاکم وقال صحیح علی شرط مسلم کذا فی الترغیب وفیه ایضا عن سعید بن المسیب قال حضر رجلا من الانصار الموت فقال انی محدثکم حدیثا ما احدثکموه الا احتسابا انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا توضأ احدکم فاحسن الوضوء الحدیث وفیه فان اتی المسجد فصلی فی جماعة غفرله فان اتی المسجد وقد صلوا بعضا وبقی بعض صلی ما ادرك واتم ما بقی کان کذالك فان اتی المسجد وقد صلوا فاتم الصلوٰة کان کذالك رواه ابوداؤد)

(৫) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করিয়া নামায পড়িবার জন্য মসজিদে গমন করে এবং সেখানে গিয়া দেখে যে, জামাত শেষ হইয়া গিয়াছে, তবুও সে জামাতে নামাযের সওয়াব পাইবে এবং এই সওয়াবের কারণে যাহারা জামাতের সহিত নামায আদায় করিয়াছেন, তাহাদের সওয়াবের মধ্যে কোন প্রকার কম করা হইবে না। (তারগীব ঃ আবূ দাউদ, নাসাঈ)

ফায়দা ঃ ইহা আল্লাহ তায়ালার কত বড় পুরস্কার ও মেহেরবাণী যে, জামাত পাওয়া না গেলেও শুধু চেষ্টা করিলেই জামাতের সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ পাকের এত বড় অনুগ্রহ সত্ত্বেও যদি আমরা তাহা গ্রহণ না করি, তবে ইহাতে কাহার কি ক্ষতি হইবে।

আর এই হাদীস দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, মসজিদে জামাত হইয়া গিয়াছে—এই সন্দেহ করিয়া মসজিদে যাওয়া মূলতবী করা উচিত নয়। কেননা, মসজিদে যাইয়া যদি দেখা যায় যে, জামাত হইয়া গিয়াছে, তবুও সওয়াব তো মিলিয়াই যাইবে। অবশ্য যদি পূর্ব হইতেই এইরূপ সঠিক জানা থাকে যে, জামাত হইয়া গিয়াছে, তবে কোন দোষ নেই।

(٦) عَنْ قُبَاثِ بْنِ اَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ اَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةِ اَرْبَعَةٍ تَتْرٰى وَصَلٰوةُ اَرْبَعَةٍ اَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرٰى وَصَلٰوةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّهُمْ اَحَدُهُمْ اَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةِ مِائَةٍ تَتْرٰى.

نبئ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ دو آدمیوں کی جماعت کی نماز کہ ایک امام ہو ایک مقتدی اللہ کے نزدیک چار آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے اسی طرح چار آدمیوں کی جماعت کی نماز آٹھ آدمیوں کی متفرق نماز سے زیادہ محبوب ہے اور آٹھ آدمیوں کی جماعت کی نماز سو آدمیوں کی متفرق نمازوں سے بڑھی ہوئی ہے ایک دوسری حدیث میں ہے اسی طرح جتنی بڑی جماعت میں نماز پڑھی جاتے گی وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے مختصر جماعت سے۔

XXXXXXXXXXX

(رواه البزار والطبرانی باسناد لاباس به کذا فی الترغیب وفی مجمع الزوائد رواه البزار والطبرانی فی الکبیر ورجال الطبرانی موثقون وعزاه فی الجامع الصغیر الی الطبرانی والبیهقی ورقم له بالصحة وعن ابی بن کعب رفعه بمعنی حدیث الباب وفیه قصة وفی اخره وکلما کثر فهو احب الی الله عزوجل رواه احمد وابوداؤد و

النسائی وابن خزیمة وابن حبان فی صحیحهما والحاکم وقد جزم یحیی بن معین و الذهلی بصحة هذا الحدیث کذا فی الترغیب)

(৬) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, দুই ব্যক্তির জামাতের নামায একজন ইমাম ও অপর জন মুক্তাদী হয় চারজন ব্যক্তির পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়। অনুরূপভাবে চার জনের জামাতে নামায আট আটজনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক উত্তম। আর আটজনের জামাতের নামায একশত জনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা উত্তম।

(তারগীব ঃ বাযযার, তাবারানী)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, এইভাবে যত বড় জামাতে নামায পড়া হইবে, আল্লাহর নিকট উহা ছোট জামাত অপেক্ষা তত বেশী পছন্দনীয় হইবে।

ফায়দা ঃ যাহারা এই কথা মনে করেন যে, দুই–চারজন লোক একত্রে মিলিয়া ঘরে বা দোকান ইত্যাদিতে জামাত করিয়া নিলেই যথেষ্ট হইবে—প্রথমতঃ ইহাতে শুরু হইতেই মসজিদে নামায পড়ার সওয়াব হয় না। দ্বিতীয়তঃ বড় জামাতের সওয়াব হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়—কেননা, জামাত যত বড় হইবে, আল্লাহ তায়ালার নিকট উহা তত বেশী প্রিয় হইবে। আর যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই একটি কাজ করিতে হইবে, তখন সেই কাজটি যে তরীকায় করিলে আল্লাহ তায়ালা বেশী সন্তুষ্ট হইবেন সেভাবেই করা উচিত।

এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা তিনটি জিনিস দেখিয়া খুশী হন—এক, জামাতের কাতার। দ্বিতীয়, যে ব্যক্তি মধ্যরাত্রে উঠিয়া (তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতেছে। তৃতীয়, যে ব্যক্তি কোন সৈন্যদলের সহিত জেহাদ করিতেছে। (জামে সগীর)

(৭) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں۔ اُن کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سُنادے۔

(رواه ابن ماجة وابن خزيمة فی صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط الشيخين كذا فی الترغيب وفی المشكوة برواية الترمذی وابی داؤد عن بريدة ثم قال رواه

ابن ماجة عن سهل ابن سعد وانس اه قلت وله شاهد فی منتخب كنز العمال برواية الطبرانی عن ابی امامة بلفظ بشر المدلجين الی المساجد فی الظلم بمنابر من نور يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزعون ذكر السيوطی فی الدر المنثور فی تفسير قوله تعالٰی انما يعمر مساجد الله عدة روايات فی هٰذا المعنی)

(৭) হযরত সাহ্‌ল (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যাহারা অন্ধকারে বেশী বেশী মসজিদে গমন করিতে থাকে, তাহাদিগকে কিয়ামত–দিবসের পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান কর। (তারগীব ঃ ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ)

ফায়দা ঃ আজ দুনিয়াতে অন্ধকার রাত্রিতে মসজিদে যাওয়ার কদর তখন বুঝে আসিবে, যখন কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখীন হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি মুছীবতের মধ্যে গ্রেফতার থাকিবে। আজকের অন্ধকারে কষ্টের বদলা ও উহার মূল্য সেই সময় হইবে যখন সূর্য অপেক্ষা অধিক আলোময় এক উজ্জ্বল নূর তাহাদের সঙ্গে হইবে।

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা কিয়ামতের দিন নিশ্চিন্তমনে নূরের মিম্বরে অবস্থান করিবে এবং অন্যান্যরা ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে থাকিবে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইবেন—আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? ফেরেশতারা আরজ করিবে, আপনার প্রতিবেশী কাহারা? এরশাদ হইবে, যাহারা মসজিদ আবাদ করিত।

এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় স্থান হইল মসজিদ আর সর্বাধিক অপ্রিয় স্থান হইল বাজার।

এক হাদীসে আছে, মসজিদসমূহ জান্নাতের বাগান। (জামে সগীর)

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, তোমরা যাহাকে মসজিদে যাইতে অভ্যস্থ দেখ তাহার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দাও।

(জামে সগীর)

অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ অর্থাৎ, যাহারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত–দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাহারাই মসজিদসমূহকে আবাদ করে।

(সূরা তওবা, আয়াত ঃ ১৮)(দুররে মানসূর)

এক হাদীসে আছে, কষ্টের সময় ওযূ করা, মসজিদের দিকে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা

গোনাহসমূহকে ধৌত করিয়া দেয়। (জামে সগীর)

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মসজিদ হইতে যত দূরে হইবে তাহার সওয়াবও তত বেশী হইবে। (জামে সগীর) কারণ, কদমে কদমে সওয়াব লিখিত হইতে থাকে—মসজিদ যত দূরে হইবে কদমও তত বেশী হইবে। এই কারণেই কোন কোন সাহাবী মসজিদের দিকে যাইতে ছোট ছোট কদম রাখিতেন।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তিনটি কাজের সওয়াব যদি মানুষের জানা থাকিত, তবে যুদ্ধ করিয়া হইলেও উহা লাভ করিত। এক, আযান দেওয়া। দ্বিতীয়, দুপুরের সময় জামাতে নামায পড়িবার জন্য যাওয়া। তৃতীয়, প্রথম কাতারে নামায পড়া।(জামে সগীর)

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, কিয়ামতের দিন যখন প্রত্যেক মানুষ অস্থির হইবে এবং সূর্য অত্যন্ত প্রখর হইবে তখন সাত প্রকারের লোক আল্লাহ তায়ালার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় পাইবে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সেও হইবে যাহার মন সর্বদা মসজিদে আটকাইয়া থাকে। যখন মসজিদ হইতে কোন প্রয়োজনে বাহিরে আসে পুনরায় মসজিদেই ফিরিয়া যাওয়ার আকাঙ্খা হয়।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, মসজিদের প্রতি যে-ব্যক্তি মহব্বত রাখে, আল্লাহ তায়ালাও তাহার প্রতি মহব্বত রাখেন। (জামে সগীর)

পবিত্র শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুমের মধ্যে যেমন সীমাহীন খায়র-বরকত ও সওয়াব রহিয়াছে, তেমনিভাবে উহার মধ্যে বহুপ্রকার কল্যাণও নিহিত রহিয়াছে। যাহার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ; কারণ আল্লাহ তায়ালার অসীম জ্ঞান ও উহার মধ্যকার নিহিত কল্যাণ উদঘাটনের সাধ্য কাহার আছে? তথাপি নিজ নিজ যোগ্যতা ও হিম্মত অনুপাতে প্রত্যেকের জ্ঞানের পরিধি হিসাবে উহার কল্যাণও বুঝে আসে। যাহার যত বেশী যোগ্যতা হয় ততই শরীয়তের হুকুমের মধ্যে নিহিত গুণাগুণ বা উপকারিতা বুঝে আসিতে থাকে। সুতরাং ওলামায়ে কেরাম নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে জামাতে নামাযের কল্যাণসমূহও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' কিতাবে এই বিষয়ে একটি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উহার তরজমা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(এক) প্রচলিত কুপ্রথা ও সামাজিক কুসংস্কারের ধ্বংসাত্মক পরিণতি হইতে বাঁচার জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক উপকারী কোন জিনিস নাই যে, এবাদতসমূহের মধ্য হইতে একটি এবাদতের এমন ব্যাপক প্রচলন ঘটানো

হয় যে, উহা জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে আদায় করা যাইতে পারে। যাহা আদায়ের ব্যাপারে শহর ও গ্রামবাসী সকলেই সমান হয়। একমাত্র ইহাই তাহাদের প্রতিযোগিতা ও গর্বের বস্তু হয়, আর ইহা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, জীবনের এমন প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয় যাহা হইতে আলাদা থাকা কঠিন ও অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহাতে এই ব্যাপকতা আল্লাহর এবাদতের ব্যাপারে সাহায্যকারী হইয়া যায় এবং ঐ সকল প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারগুলি যাহা পূর্বে ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ ছিল উহাই হক ও সত্যের দিকে আকর্ষণকারী হইয়া যায়। যেহেতু এবাদতসমূহের মধ্যে নামাযের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং দলীল-প্রমাণের দিক দিয়া অধিকতর মজবুত আর কোন এবাদত নাই, এইজন্য নিজেদের মধ্যে অধিক পরিমাণে ইহার প্রচলন ঘটানো এবং ইহার জন্য বিশেষ সমাবেশের ব্যবস্থা করা ও পরস্পর একমত হইয়া ইহাকে আদায় করা একান্ত জরুরী সাব্যস্ত হইয়াছে।

(দুই) প্রত্যেক মাযহাব ও দ্বীনের মধ্যে এমন একদল লোক থাকে যাহারা অন্যান্যদের জন্য অনুসরণীয় হয়। আবার কিছু লোক দ্বিতীয় স্তরে এমনও থাকে যাহাদিগকে একটু উৎসাহ প্রদান বা সচেতন করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। আরও কিছু দুর্বল ও কমজোর লোক তৃতীয় স্তরে এমন থাকে, যাহাদিগকে সকলের সাথে সমাবেশে এবাদতের জন্য বাধ্য না করা হইলে তাহারা অবহেলা ও গাফলতির দরুন এবাদতই ছাড়িয়া দেয়। কাজেই অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজন ইহাই যে, সকলেই জামাতবন্দী হইয়া এবাদত আদায় করিবে। এই পন্থা অবলম্বনের কারণে এবাদত পরিত্যাগকারীগণ এবাদতকারীদের হইতে পৃথক হইয়া যাইবে এবং এবাদতে আগ্রহী ও অনাগ্রহীদের মধ্যে খোলা পার্থক্য হইয়া যাইবে। এমনিভাবে ওলামাদের অনুসরণ করার দ্বারা অজ্ঞ লোকেরা জ্ঞানী হইয়া যাইবে এবং জাহেল ও মূর্খরা এবাদতের তরিকা জানিতে পারিবে। এইভাবে এবাদত তাহাদের জন্য অভিজ্ঞ লোকের সম্মুখে গলানো চান্দি রাখার মত হইবে। যাহাতে জায়েয, নাজায়েয ও খাঁটি-ভেজালের মধ্যে খোলাখুলি পার্থক্য হইয়া যায়—অতঃপর জায়েযকে মজবুত করা হয় আর নাজায়েযকে দূর করা হয়।

(তিন) ইহা ছাড়া যেখানে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ রাখে, আল্লাহর রহমত তলব করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এমন লোক উপস্থিত থাকেন এবং সকলেই সর্বান্তঃকরণে একমাত্র আল্লাহ পাকের দিকেই রুজু থাকেন, মুসলমানদের এরূপ সমাবেশ বরকত নাযিল হওয়া এবং আল্লাহর রহমত

আকর্ষণ করার ব্যাপারে আশ্চর্য ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য রাখে।

(চার) উম্মতে মুহাম্মাদিয়া কায়েম হওয়ার উদ্দেশ্যই হইল আল্লাহর আওয়াজ বুলন্দ হউক এবং দ্বীন-ইসলাম বিজয়ী ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। আর এই উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকগণ, শহরবাসী ও গ্রামবাসী এবং ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই এক জায়গায় জমা হইয়া ইসলামের সবচেয়ে বড় এবং প্রতীকী নিদর্শনবাহী এবাদতকে আদায় না করিবে। এই নিগূঢ় রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শরীয়ত জুমআ এবং জামাতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, এইগুলিকে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আদায় করিতে উৎসাহিত করিয়াছে এবং এইগুলিকে পরিত্যাগ করার পরিণামে শাস্তির কথা নাযিল হইয়াছে।

মুসলমানদের এই সমাবেশ যেহেতু দুই পর্যায়ে হইতে পারে—গ্রাম বা মহল্লা পর্যায়ে এবং সম্পূর্ণ শহর পর্যায়ে, আর গ্রাম বা মহল্লার সমাবেশ সবসময়ই সহজ, পক্ষান্তরে সারা শহর পর্যায়ের সমাবেশ করা কঠিন ও কষ্টকর। কাজেই প্রত্যেক নামাযের সময় জামাতের নামাযের মাধ্যমে মহল্লার সমাবেশ এবং অষ্টম দিনে শহরের সমাবেশ জুমার নামাযের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জামাত ত্যাগ করার শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার হুকুম পালন করিলে যেমন পুরস্কারদানের ওয়াদা করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার হুকুম অমান্য করিলে অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ঘোষণাও করিয়াছেন। ইহাও আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ যে, হুকুম পালন করিলে তিনি অফুরন্ত নেয়ামত ও পুরস্কারের ওয়াদা করিয়াছেন। নতুবা বান্দা হিসাবে তো শুধু শাস্তি হওয়াই উচিত ছিল। কেননা, বান্দার কর্তব্য হইল হুকুম পালন করিয়া যাওয়া—ইহার জন্য আবার পুরস্কার কিসের? অপরদিকে মনিবের নাফরমানীর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হইতে পারে—সেইজন্য যতই শাস্তি দেওয়া হউক তাহা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং বিশেষ কোন শাস্তি উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। তবুও আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীমাহীন মহব্বত ও মেহেরবানী এই যে, ভাল-মন্দ বর্ণনা করিয়া বিভিন্নভাবে সতর্ক করিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। এতদসত্ত্বেও যদি আমরা না বুঝি তবে নিজেদেরই ক্ষতি করিব।

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهٖ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے (وہیں پڑھ لے) تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی. صحابہؓ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے۔ ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف ہو۔

(رواه ابوداؤد وابن حبان فی صحیحه وابن ماجة بنحوه كذا فی الترغیب وفی المشكوٰة رواه ابوداؤد والدارقطنی)

(১) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া কোনরকম ওজর ব্যতীত জামাতে হাজির হয় না (নিজের জায়গাতেই নামায পড়িয়া নেয়), তাহার নামায কবুল হয় না। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ওজর বলিতে কি বুঝায়? বলিলেন, অসুস্থতা বা ভয়-ভীতি।

(তারগীব ঃ আবূ দাউদ, ইবনে হিব্বান॥ মিশকাত ঃ আবূ দাউদ, দারা কুতুনী)

ফায়দা ঃ কবুল না হওয়ার অর্থ এই যে, এই নামায পড়া দ্বারা আল্লাহর তরফ হইতে যে পুরস্কার ও সওয়াব পাওয়া যাইত তাহা পাওয়া যাইবে না। অবশ্য ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। যে সমস্ত হাদীসে নামায না হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল হাদীসেরও ব্যাখ্যা ইহাই। কেননা, এমন হওয়াকে কি হওয়া বলা যায় যাহাতে কোন পুরস্কার বা সম্মান পাওয়া গেল না? ইহা আমাদের ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর অভিমত। নতুবা কিছুসংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে বিনা ওজরে জামাত ত্যাগ করা হারাম এবং জামাতে নামায আদায় করা ফরজ। এমনকি অনেক ওলামায়ে কেরামের মতে নামাযই হয় না। হানাফী আলেমগণের মতে নামায যদিও হইয়া যাইবে কিন্তু জামাত তরক করার কারণে অবশ্যই অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে ইহাও নকল করা হইয়াছে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ইহাও ফরমাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আযানের আওয়াজ শুনিয়াও জামাতে শরীক হয় না সে নিজেও মঙ্গল কামনা করে নাই এবং তাহার সহিতও মঙ্গল কামনা করা হয় নাই। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি

আযান শুনিয়া জামাতে শরীক হইল না তাহার কান গলিত সীসা দ্বারা ভরিয়া দেওয়াই উত্তম।

(২) عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَلْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللّٰهِ يُنَادِيْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يُجِيْبُهُ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی (یعنی مؤذن) کی آواز سُنے اور نماز کو نہ جائے۔

(رواه احمد والطبرانی من رواية زبان بن فائد كذا فی الترغيب وفی مجمع الزوائد رواه الطبرانی فی الكبير وزبان ضعفه ابن معين ووثقه ابوحاتم اه وعزاه فی الجامع الصغير الی الطبرانی ورقم له بالضعف)

(২) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ঐ ব্যক্তির কাজ একেবারে জুলুম, কুফর এবং মুনাফেকী, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর (মুআযযিনের) ডাক শুনিয়াও মসজিদে হাজির হয় না। (তারগীব ঃ আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীস শরীফে কত কঠোরভাবে সতর্ক করা হইয়াছে এবং ধমক দেওয়া হইয়াছে যে, যাহারা জামাতে হাজির হয় না তাহাদের এই কাজকে কাফের ও মুনাফেকদের কাজ বলা হইয়াছে। যেন এমন কাজ মুসলমানের দ্বারা হইতেই পারে না। আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, মুআয্যিনের আযান শুনিয়া মসজিদে হাজির হয় না।

হযরত সুলাইমান ইবনে আবী হাছমা (রাযিঃ) খুবই উঁচু মর্তবার সাহাবী ছিলেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প বয়স হওয়ার কারণে তাঁহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ হয় নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে বাজারের তদারকী কাজের দায়িত্ব দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন ফজরের জামাতে শরীক হইতে পারেন নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ) খবর নেওয়ার জন্য তাঁহার বাড়ীতে তশরীফ লইয়া গেলেন এবং তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুলাইমান আজ ফজরের নামাযে হাজির হয় নাই কেন? তাহার মা বলিলেন, সারারাত্র সে নফল নামাযে মশগুল ছিল ; তাই ঘুমের চাপে চোখ লাগিয়া গিয়াছিল। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, রাতভর নফল পড়া অপেক্ষা ফজরের নামায জামাতে আদায়

করা আমার কাছে বেশী পছন্দনীয়।

(৩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ فِتْيَتِيْ فَيَجْمَعُوْا لِيْ حُزَمًا مِّنْ حَطَبٍ ثُمَّ اٰتِيْ قَوْمًا يُّصَلُّوْنَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَاُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کرکے لائیں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جاکر ان کے گھروں کو جلادوں۔

(رواه مسلم وابوداؤد وابن ماجة والترمذی كذا فی الترغيب قال السيوطی فی الدر اخرج ابن ابی شيبة والبخاری ومسلم وابن ماجة عن ابی هريرة رفعه اثقل الصلوة على المنافقين صلوة العشاء وصلوة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلوة فتقام الحديث بنحوه)

(৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয় কিছু সংখ্যক যুবককে অনেকগুলি জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলি। অতঃপর আমি ঐসব লোকের নিকট যাই, যাহারা বিনা ওজরে ঘরে নামায পড়িয়া নেয় এবং যাইয়া তাহাদের বাড়ী–ঘর পোড়াইয়া দেই। (তারগীব ঃ মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ উম্মতের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও মেহেরবানী এইরূপ ছিল যে, কোন ব্যক্তির সামান্যতম কষ্টও তিনি বরদাশত করিতে পারিতেন না। তাহা সত্ত্বেও যাহারা ঘরে নামায পড়িয়া নেয়, তাহাদের প্রতি তাঁহার এমনই রাগ যে, তিনি তাহাদের বাড়ী–ঘর আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিতে প্রস্তুত।

(৪) عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَّلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں تین آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہوجاتا ہے اسلئے جماعت کو ضروری سمجھو، بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔

(رواه احمد و ابوداؤد والنسائی و ابن خزیمة و ابن حبان فی صحیحیهما والحاکم و زاد رزین فی جامعه وان ذئب الانسان الشیطان اذا خلابه اکله کذا فی الترغیب ورقم له فی الجامع الصغیر بالصحة وصححه الحاکم واقره علیه الذهبی

(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে গ্রামে বা মাঠে কমপক্ষে তিনজন লোক থাকে আর সেখানে জামাতের সহিত নামায পড়া হয় না, তাহাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। কাজেই জামাতকে জরুরী মনে কর। দল ত্যাগকারী ছাগলকে বাঘে খাইয়া ফেলে। আর মানুষের বাঘ হইল শয়তান।

(তারগীব ঃ আবূ দাউদ, নাসাঈ, আহমদ)

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যাহারা ক্ষেত–খামারে কাজ করে, তাহারা তিনজন হইলেও জামাতের সহিত নামায আদায় করা উচিত। বরং দুইজন হইলেও জামাতে নামায আদায় করা উত্তম। সাধারণতঃ কৃষকেরা নামাযই পড়ে না—ক্ষেত–খামারের ব্যস্ততাকে তাহারা ওজর হিসাবে যথেষ্ট মনে করিয়া থাকে। আর যাহাদিগকে বেশ দ্বীনদার মনে করা হয় তাহারাও একা একাই নামায পড়িয়া নেয়। অথচ কয়েকজন কৃষক একত্র হইয়া জামাতে নামায পড়িয়া নিলে কত বড় জামাত হইয়া যায় এবং কত বড় সওয়াবের অধিকারী হইতে পারে। দুই–চারিটি পয়সা উপার্জনের জন্য শীত–গরম, রৌদ্র–বৃষ্টি সবকিছু উপেক্ষা করিয়া দিনভর কাজে মশগুল হইয়া থাকে, অথচ এত বড় সওয়াবকে তাহারা বরবাদ করিয়া দেয়, ইহার প্রতি তাহারা মোটেও ভ্রূক্ষেপ করে না। অথচ তাহারা যদি মাঠে জামাতের সাথে নামায পড়ে তবে আরও বেশী সওয়াব হয়। এক হাদীসে আছে, পঞ্চাশ নামাযের সওয়াব হয়।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন কোন রাখাল কোন পাহাড়ের পাদদেশে অথবা মাঠে আযান দিয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করে তখন আল্লাহ তায়ালা খুবই খুশী হন এবং গর্ব করিয়া ফেরেশতাদিগকে বলেন, তোমরা দেখ—আমার বান্দা আযান দিয়া নামায পড়িতে শুরু করিয়াছে, আমার ভয়েই সে এইসব করিতেছে, আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম এবং তাহার জন্য জান্নাতের ফয়সালা করিয়া দিলাম। (মিশকাত)

(٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ وَ

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات

لَا يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجُمُعَةَ فَقَالَ هٰذَا فِى النَّارِ۔

بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا (اس کے متعلق کیا حکم ہے)

(رواه الترمذی موقوفا کذا فی الترغیب وفی تنبیه الغافلین روی عن مجاهد ان رجلا جاء الی ابن عباس فقال یا ابن عباس ما تقول فی رجل فذکره بلفظه زاد فی اٰخره فاختلف الیه شهرا یسأله عن ذٰلک وهو یقول هو فی النار)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, এক ব্যক্তি সারাদিন রোযা রাখে এবং সারা রাত্র নফল নামায পড়ে, কিন্তু জুমআ ও জামাতে শরীক হয় না—তাহার সম্পর্কে কি বলেন। তিনি উত্তর করিলেন, লোকটি জাহান্নামী। (তারগীব ঃ তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এই ব্যক্তি যদিও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করিয়া জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে, যেহেতু সে মুসলমান। কিন্তু নাজানি কতকাল তাহাকে জাহান্নামে পড়িয়া থাকিতে হইবে। জাহেল ছুফীদের মধ্যে ওজীফা এবং নফলের প্রতি জোর দেখা যায় কিন্তু জামাতের প্রতি তাহাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহাকেই তাহারা বুযুর্গী মনে করে। অথচ আল্লাহর মাহবুব নবীর অনুসরণ করাই হইল আসল বুযুর্গী। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ তায়ালা লা'নত বর্ষণ করেন ঃ প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি যাহার উপর মুক্তাদীগণ যুক্তিসংগত কারণে নারাজ থাকা সত্ত্বেও সে ইমামতি করে। দ্বিতীয় ঐ নারী যাহার উপর তাহার স্বামী নারাজ। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে আযান শুনিয়া জামাতে শরীক হয় না।

(٦) اَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ عَنْ كَعْبِ نِ الْحَبْرِ قَالَ وَالَّذِىْ اَنْزَلَ التَّوْرٰاةَ عَلٰى مُوْسٰى وَالْاِنْجِيْلَ عَلٰى عِيْسٰى وَالزَّبُوْرَ عَلٰى دَاوٗدَ وَالْفُرْقَانَ عَلٰى مُحَمَّدٍ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ فِى الصَّلَوٰتِ الْمَكْتُوْبَاتِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ اِلٰى قوله وَهُمْ سَالِمُوْنَ اَلصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ اِذَا نُوْدِىَ بِهَا واخرج البیهقی فی الشعب عن سعید بن جبیر قال

حضرت کعبؓ احبار فرماتے ہیں کہ قسم ہے اُس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٰؑ پر اور انجیل حضرت عیسیٰؑ پر اور زبور حضرت داؤدؑ پر (علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام) نازل فرمائی اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارہ میں جہاں اذان ہوتی ہو نازل ہوئی ہیں ترجمہ آیات جس دن حق تعالیٰ شانہٗ ساق کی تجلی فرمائیں

الصلوٰت فی الجماعات واخرج البیہقی
عن ابن عباس قال الرجل یسمع الاذان
فلا یجیب الصلوۃ کذا فی الدر المنثور
قلت وتمام الاٰیۃ یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ
سَاقٍ وَّیُدْعَوْنَ اِلَی السُّجُوْدِ فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ
خَاشِعَۃً اَبْصَارُھُمْ تَرْھَقُھُمْ ذِلَّۃٌ
وَقَدْ کَانُوْا یُدْعَوْنَ اِلَی السُّجُوْدِ وَ
ھُمْ سَالِمُوْنَ ۵(ن-۲)

گے (جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی) اور لوگ
اس دن سجدہ کے لئے بلائے جاویں گے،
تو یہ لوگ سجدہ نہیں کرسکیں گے. اُن کی
آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی
اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اسلئے
کہ یہ لوگ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے
جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے
(پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے)

(৬) হযরত কা'ব আহবার (রাযিঃ) বলিয়াছেন, সেই আল্লাহর কসম, যিনি হযরত মূসা (আঃ)–এর উপর তৌরাত, ঈসা (আঃ)এর উপর ইঞ্জীল, দাঊদ (আঃ)এর উপর যবুর এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন শরীফ নাযিল করিয়াছেন—কুরআনের এই আয়াতসমূহ ফরজ নামাযগুলি জামাতের সহিত এমনই জায়গায় আদায় করার ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে, যেখানে আযান হয়। (আয়াতসমূহের তরজমা ঃ–) যেদিন আল্লাহ পাক ছাক–এর তাজাল্লী প্রকাশ করিবেন (যাহা এক বিশেষ ধরণের তাজাল্লী হইবে) এবং সকল মানুষকে সেজদার জন্য ডাকা হইবে, সেইদিন তাহারা সেজদা করিতে পারিবে না, তাহাদের চোখ লজ্জায় অবনত হইয়া থাকিবে, তাহাদের সর্বাঙ্গে অপমান বিরাজ করিবে। কারণ তাহাদিগকে দুনিয়াতে সেজদার জন্য ডাকা হইত কিন্তু সুস্থ–সবল থাকা সত্ত্বেও সেজদা করিত না। (দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ ছাক–এর তাজাল্লী এক বিশেষ ধরনের জ্যোতি যাহা হাশরের ময়দানে প্রকাশ হইবে। ইহা দেখিয়া সমস্ত মুসলমান সেজদায় লুটাইয়া পড়িবে। কিন্তু কিছু লোকের কোমর শক্ত হইয়া যাইবে ; ফলে তাহারা সেজদা করিতে পারিবে না। এই সমস্ত লোক কাহারা সেই সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে ঃ— হযরত কা'ব আহবার (রাযিঃ) হইতে এক তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে ; হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখও এই একইরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদিগকে জামাতে নামায পড়ার জন্য ডাকা হইত, কিন্তু তাহারা জামাতে নামায পড়িত না।

দ্বিতীয় তাফসীর হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

শুনিয়াছি যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা দুনিয়াতে লোক দেখানোর জন্য নামায পড়িত।

তৃতীয় তাফসীর মতে ইহারা কাফের, যাহারা দুনিয়াতে মোটেই নামায পড়িত না।

চতুর্থ তাফসীর অনুযায়ী ইহারা হইল মোনাফেক। (আল্লাহই অধিক জানেন এবং তাঁহার জ্ঞানই পূর্ণতম।)

হযরত কাব আহবার (রাযিঃ) কসম খাইয়া যে তাফসীর বর্ণনা করিলেন এবং ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর ন্যায় উঁচু মর্তবার সাহাবী ও ইমামে তাফসীর যাহাকে সমর্থন করিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ব্যাপারটি কত গুরুতর—হাশরের ময়দানে অপমানিত ও লজ্জিত হইতে হইবে এবং যেখানে সমগ্র মুসলমান সেজদায় মশগুল থাকিবে সেখানে তাহারা সেজদা করিতে পারিবে না!

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ ছাড়াও নামায তরক করা সম্পর্কে আরও বহু শাস্তি ও সতর্কবাণী বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত মুসলমানের জন্য একটি সতর্কবাণীরও প্রয়োজন ছিল না ; কেননা আল্লাহ ও রাসুলের আদেশই তাহার জন্য যথেষ্ট। আর যাহাদের নিকট কদর নাই তাহাদের জন্য হাজার ধরণের ধমকও নিস্ফল। যখন শাস্তির সময় আসিয়া যাইবে তখন লজ্জা ও অনুতাপ হইবে কিন্তু উহাতে কোন কাজ হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

খুশু-খুজূর (একাগ্রতা) বর্ণনা

অনেক লোক এমন আছেন, যাহারা নামায পড়েন এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যাহারা জামাআতের সহিত নামায পড়ারও এহতেমাম করিয়া থাকেন ; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এরূপ খারাপভাবে পড়িয়া থাকেন যে, তাহা নেকী ও সওয়াবের বস্তু হওয়ার পরিবর্তে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে মুখের উপর ছুড়িয়া মারা হয়—যদিও একেবারে নামায না পড়া হইতে এইরূপ মন্দভাবে পড়িয়া নেওয়াও উত্তম। কেননা, একেবারে নামায না পড়িলে যে আজাব ও শাস্তির কথা রহিয়াছে, তাহা খুবই মারাত্মক এবং খুবই কঠিন। মন্দভাবে নামায পড়ার কারণে যদিও উহা কবূল হওয়ার মত হইল না, মুখের উপর ছুড়িয়া মারা হইল এবং ইহাতে কোনরূপ সওয়াবও হইল না, কিন্তু নামায একেবারে না পড়িলে যে পর্যায়ের নাফরমানী ও অবাধ্যতা হইত তাহা তো অন্ততঃপক্ষে হইবে না। কিন্তু আসল কর্তব্য হইল এই যে, যখন মানুষ নামাযের জন্য সময় খরচ করে, কাজ-কারবার ছাড়িয়া রাখে, কষ্ট স্বীকার করে, তখন যাহাতে এই নামায বেশী হইতে বেশী সুন্দর, ওজনী ও মূল্যবান হয়, সেইজন্য চেষ্টা করা চাই ; ইহাতে কোন রকমের কমি করা চাই না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন—যদিও এই আয়াত কুরবানীর সহিত সম্পর্ক রাখে কিন্তু আল্লাহর হুকুম-আহকাম তো সবই এক। এরশাদ হইতেছে ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিকট কুরবানীর গোশতও পৌঁছে না এবং উহার রক্তও পৌঁছে না ; বরং তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া থাকে তোমাদের পরহেজগারী ও এখলাস। (সূরা হজ্জ, আয়াত ঃ ৩৭)

অতএব, যে পর্যায়ের এখলাস হইবে, সেই পর্যায়েই কবুল হইবে। হযরত মুআয (রাযিঃ) ফরমাইয়াছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে ইয়ামানে পাঠাইয়াছিলেন, তখন আমি তাহার নিকট শেষ ওসিয়তের আবেদন করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দ্বীনের প্রতিটি কাজে এখলাসের এহতেমাম করিবে, কেননা এখলাসের সহিত সামান্য আমলও অনেক বেশী।

হযরত সাওবান (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, এখলাসওয়ালারা সুখী হউক, কেননা তাহারা হেদায়াতের আলো, তাহাদের কারণেই অনেক বড় বড় ফেৎনা দূর হইয়া যায়। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা কমজোর ও দুর্বল লোকদের বরকতে এই উম্মতের সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহাদের দোয়া, তাহাদের নামায এবং তাহাদের এখলাসের ওসীলায় সাহায্য করিয়া থাকেন। (তারগীব) নামায সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ

অর্থাৎ, বড়ই ক্ষতি ও ধ্বংস রহিয়াছে ঐ সমস্ত লোকের, যাহারা নিজেদের নামায হইতে গাফেল রহিয়াছে। তাহারা এমন যে, (নামাযের মধ্যে) রিয়াকারী করিয়া থাকে। (সূরা মাউন, আয়াত ঃ ৪-৬)

'গাফেল থাকার' বিভিন্ন তফসীর করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এক তফসীর এই যে, ওয়াক্তের কোন খবর রাখে না ; নামায কাজা করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় তফসীর এই যে, নামাযের প্রতি মনোযোগী হয় না ; এদিক সেদিক মশগুল হইয়া থাকে। তৃতীয় তফসীর এই যে, এই খবর রাখে না যে, কত রাকআত নামায পড়া হইল।

অন্য এক আয়াতে মুনাফেকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হইতেছে ঃ

وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ۙ

অর্থাৎ, এবং যখন তাহারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন অত্যন্ত অলসভাবে দাঁড়ায়, কেবল লোকদিগকে দেখাইয়া থাকে (যে আমরাও নামাযী), তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে না ; কিন্তু অতি অল্প।

(সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১৪২)

অন্য এক আয়াতে কয়েকজন নবী আলাইহিমুস-সালামের কথা উল্লেখ করিয়া এরশাদ করিতেছেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۙ

অর্থাৎ, এই সকল নবীদের পর এমন কিছু অযোগ্য লোক পয়দা হইয়াছে, যাহারা নামাযকে বরবাদ করিয়া দিয়াছে এবং খাহেশাতের অনুসরণ করিয়াছে। অতএব তাহারা শীঘ্রই আখেরাতে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে। (সূরা মারয়াম, আয়াত ঃ ৫৯)

'গাই' শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল, গোমরাহী, পথভ্রষ্টতা। ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আখেরাতের বরবাদী ও ধ্বংস। অনেক তফসীরকার লিখিয়াছেন যে, 'গাই' জাহান্নামের একটি স্তর, যেখানে রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি জমা হইবে এবং উহার মধ্যে এই সমস্ত লোককে নিক্ষেপ করা হইবে।

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইতেছে ঃ

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَلَا يَأْتُوْنَ
الصَّلٰوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُوْنَ ۝

অর্থাৎ, তাহাদের দান-খয়রাত কবুল না হওয়ার পথে একমাত্র বাধা হইল এই যে, তাহারা আল্লাহর সহিত এবং তাঁহার রাসূলের সহিত কুফর করিয়াছে, নামায পড়িলেও অলসতার সহিত পড়িয়াছে এবং দান করিলেও অনিচ্ছা ও অসন্তোষের সহিত করিয়াছে।

(সূরা তওবা, আয়াত ঃ ৫৪)

অপরদিকে উত্তমরূপে নামায আদায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۝
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ۝ إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ
وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝
الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۝

অর্থাৎ, নিশ্চয় ঐসকল মুমিন সফলকাম হইয়াছে, যাহারা বিনয় ও খুশু সহকারে নামায আদায় করে, বেহুদা কাজ হইতে নিজেদেরকে ফিরাইয়া রাখে, যাকাত প্রদান করে (অথবা নিজেদের চরিত্রকে সংশোধন করে), নিজেদের স্ত্রী এবং দাসীদের ছাড়া অন্যদের হইতে আপন লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে—কেননা, এই ক্ষেত্রে কোন দোষ নাই ; তবে যাহারা ইহা ব্যতীত অন্য স্থানে যৌন-খাহেশ পুরা করে, তাহারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী। যাহারা আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখে এবং যাহারা নিজ নামাযের এহতেমাম করে—একমাত্র তাহারাই জান্নাতুল-ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে।

(সূরা মু'মিনূন, আয়াত ঃ ১-১১)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, ফেরদাউস জান্নাতের সর্বোন্নত ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। সেখান হইতে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয় ; ইহারই উপর আল্লাহ তায়ালার আরশ হইবে। তোমরা যখন জান্নাতের জন্য দোয়া কর তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া করিও।

অন্য এক আয়াতে নামায সম্পর্কে এরশাদ হইতেছে ঃ

وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ۝

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই নামায বড় কঠিন, তবে যাহাদের অন্তরে (আল্লাহর প্রতি) খুশু আছে, তাহাদের জন্য মোটেই কঠিন নহে। ইহারা ঐ সকল লোক যাহারা এই কথা খেয়াল রাখে যে, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তাহারা নিজেদের রবের সহিত মিলিত হইবে এবং মৃত্যুর পর তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইবে। (সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ৪৫/৪৬)

এই সকল লোকের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ তায়ালা এক আয়াতে এরশাদ করিয়াছেন ঃ فِيْ بُيُوْتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ
فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ
وَإِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ
أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

অর্থাৎ, যে সকল ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে এবং উহাতে যিকির করিতে আল্লাহ পাক হুকুম করিয়াছেন, সেই সকল ঘরে এমন সব লোক সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করে, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচাকেনা আল্লাহর যিকির, নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা হইতে গাফেল করিতে পারে না। তাহারা এমন এক দিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও চক্ষুসমূহ উলট-পালট হইয়া যাইবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) এবং তাহারা এইসব এইজন্যই করিতেছে যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের নেক আমলের বদলা দান করেন ; বরং আপন করুণায় বদলা হইতেও আরও অনেক বেশী তাহাদিগকে দান করেন ; আর আল্লাহ তায়ালা তো যাহাকে ইচ্ছা অগণিত দান করিয়া থাকেন।

(সূরা নূর, আয়াত ঃ ৩৬-৩৯)

تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لئے   در تری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے

অর্থাৎ, তুমি এমন দাতা যে, দেওয়ার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজা সদা উন্মুক্ত থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, নামায কায়েম করার অর্থ হইল, উহার রুকু ও সেজদা সঠিকভাবে আদায় করে, পুরাপুরি আল্লাহর দিকে রুজু থাকে এবং অত্যন্ত খুশু সহকারে নামায পড়ে।

হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) হইতেও এই কথা নকল করা হইয়াছে যে, নামায কায়েম করার অর্থ হইল—নামাযের ওয়াক্তসমূহের হেফাজত করা এবং ওযূ, রুকু ও সেজদাকে উত্তমরূপে আদায় করা—অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত জায়গায় 'আকামাস–সালাতা' এবং 'ইউকীমূনাস–সালাতা' বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত জায়গায় এই অর্থকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। (দুররে মানসূর) বস্তুতঃ ইহারাই হইল ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের প্রসঙ্গে অন্য এক আয়াতে এইভাবে বলা হইয়াছে ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝

অর্থাৎ, পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার খাছ বান্দা হইল তাহারা, যাহারা যমীনের উপর বিনয়ের সহিত চলে (অর্থাৎ অহংকারের সহিত চলাফেরা করে না) যখন তাহাদের সহিত জাহেল লোকেরা (মূর্খের মত) কথাবার্তা বলে, তখন তাহারা বলে—সালাম। (অর্থাৎ তাহারা শান্তির কথা বলে যাহাতে অশান্তি দূর হয়, অথবা দূর হইতে তাহারা সালাম বলিয়াই ক্ষান্ত হয়) এবং ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা রাতভর আপন রবের উদ্দেশ্যে সেজদা এবং নামাযে দণ্ডায়মান থাকিয়া কাটাইয়া দেয়।"

(সূরা ফোরকান, আয়াত ঃ ৬৩/৬৪)

অতঃপর তাহাদের আরও কতিপয় গুণের উল্লেখ করিয়া এরশাদ ফরমান ঃ

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝

অর্থাৎ, এই সকল লোককে তাহাদের ধৈর্যের (অথবা দ্বীনের উপর অটল থাকার) বদলাস্বরূপ বেহেশতের বালাখানাসমূহ দান করা হইবে এবং সেখানে তাহাদিগকে ফেরেশতাদের তরফ হইতে দোয়া ও সালাম দ্বারা স্বাগত জানানো হইবে। তাহারা চিরকাল সেখানে অবস্থান করিবে। তাহা কতই না উত্তম ঠিকানা ও আবাসস্থল। (সূরা ফোরকান, আঃ ৭৫/৭৬)

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ پ ١٣ ع ٩

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে এবং তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদের উপর সালাম (শান্তি)—কেননা তোমরা দ্বীনের উপর অটল থাকিয়া ধৈর্য ধারণ করিয়াছ। অতএব, কতই না চমৎকার শেষ আবাসস্থল। (সূরা রায়াদ, আয়াত ঃ ২৩–২৪)

তাহাদের প্রশংসায় অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

অর্থাৎ, তাহারা এমন লোক, যাহাদের পার্শ্বদেশ আরামের বিছানা হইতে পৃথক থাকে, (অর্থাৎ তাহারা নামাযে মগ্ন থাকে) আপন রবকে আজাবের ভয় ও সওয়াবের আশায় ডাকিতে থাকে এবং তাহারা আমার দেওয়া নেয়ামত হইতে খরচ করিয়া থাকে। এইসব লোকের জন্য অদৃশ্য জগতে তাহাদের চক্ষু শীতল করার মত কি কি পুরস্কার মওজুদ রহিয়াছে ; তাহা কেহই জানে না। যাহা তাহাদের নেক আমলের বদলা স্বরূপ হইবে। (সূরা আলিফ, লাম, মীম সেজদা, আয়াত ঃ ১৬–১৭)

তাহাদের শানে আরও এরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۝ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝ پ ٢٦ ع ١٨

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুত্তাকীগণ বেহেশতের বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করিবে। আপন পরওয়ারদিগারের দানকে তাহারা আনন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে থাকিবে। নিশ্চয় তাহারা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) নেক আমলকারী ছিল, রাত্রে তাহারা খুব কমই নিদ্রা যাইত, শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহারা এস্তেগফার ও ক্ষমা–প্রার্থনা করিত।(সূরা জারিয়াত,আয়াত ঃ ১৫–১৮)

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

যাহারা বে–দ্বীন তাহাদের সহিত কি ঐ সমস্ত লোকের তুলনা হইতে পারে, যাহারা রাত্রিতে কখনও সেজদায় পড়িয়া থাকে আবার কখনও নিয়ত বাঁধিয়া (আল্লাহর এবাদতে) দাঁড়াইয়া থাকে। আখেরাতকে ভয় করে

এবং স্বীয় পরওয়ারদিগারের রহমতের আশা পোষণ করে। (আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন) যাহারা জানে আর যাহারা জানে না—এই দুই শ্রেণী কি কখনও সমান হইতে পারে? (আর ইহা নিতান্তই স্পষ্ট বিষয় যে, যাহারা জানে তাহারা আপন রবের এবাদত করিবেই ; আর যাহারা এমন দয়ালু মাওলার এবাদত করে না তাহারা শুধু অজ্ঞ নয় বরং অজ্ঞ হইতেও অজ্ঞ।) বস্তুতঃ উপদেশ গ্রহণ করে একমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই।

(সূরা যুমার, আয়াত ঃ ৯)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۙ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۙ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۙ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۙ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۙ

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষকে অস্থির চিত্তরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোনরূপ বিপদে পড়িলেই সে অতিমাত্রায় হাহুতাশ আরম্ভ করে, আর যখন সে কোনরূপ কল্যাণ লাভ করে তখন সে কৃপণতা শুরু করে (যাহাতে আর কেহ এই কল্যাণ লাভ করিতে না পারে)। তবে ঐসব নামাযী লোকদের ব্যাপার স্বতন্ত্র যাহারা পাবন্দী ও স্থিরতার সহিত নামায আদায় করে।

(সূরা মায়ারিজ, আয়াত ঃ ১৯–২৩)

এই আয়াতের পর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের আরও কতিপয় গুণ বর্ণনা করার পর এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۙ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ۙ

অর্থাৎ, আর যাহারা নিজেদের নামাযসমূহের হেফাজত করে তাহারাই ঐ সকল লোক যাহাদিগকে বেহেশতে সম্মানিত করা হইবে।

(সূরা মায়ারিজ, আয়াত ঃ ৩৪–৩৫)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ছাড়া আরও অনেক আয়াতে নামাযের হুকুম এবং নামাযীদের ফযীলত সম্মান ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নামায এইরূপ দৌলতই বটে। এই কারণেই সরদারে দোজাহান, ফখ্‌রে রুসুল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে রহিয়াছে। এই কারণেই হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) দোয়া করিতেন ঃ

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদিগার, আমাকে বিশেষ এহতেমামের সহিত নামায আদায়কারী বানাইয়া দাও এবং আমার বংশধরের মধ্যেও এমন

লোক পয়দা কর, যাহারা নামাযের এহতেমাম করিবে। হে পরওয়ারদিগার, আমার এই দোয়া কবূল কর। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ঃ ৪০) আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) 'খলীল' উপাধিতে গৌরবান্বিত হওয়া সত্ত্বেও নামাযের পাবন্দী ও এহতেমামের ব্যাপারে তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আপন প্রিয় হাবীব সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম করিতেছেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ○ (سورة طٰهٰ - ع ٨)

অর্থাৎ, আপনি আপনার গরিবার–পরিজনকে নামাযের জন্য হুকুম করিতে থাকুন এবং নিজেও উহার এহতেমাম করিতে থাকুন। আপনার দ্বারা আমি রুজি (উপার্জন) চাই না ; রিযিক তো আমিই আপনাকে দিব। উত্তম পরিণাম একমাত্র পরহেজগারীর মধ্যেই নিহিত। (সূরা ত্বহা, আঃ ১৩২)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন অভাব অনটন ইত্যাদি দেখা দিত, তখন তিনি পরিবারের সকলকে নামাযের আদেশ করিতেন এবং উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিতেন।

পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামেরও এই একই রীতি ছিল—যখনই তাঁহারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন তখনই তাহারা নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন। কিন্তু আমরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল সম্পর্কে এত গাফেল ও বেপরওয়া যে, ইসলাম ও মুসলমানীর লম্বা–চওড়া দাবী করা সত্ত্বেও ইহার প্রতি মনোযোগী হই না। বরং যদি কেহ নামাযের কথা বলে বা নামাযের দিকে দাওয়াত দেয়, তবে তাহার সহিত ঠাট্টা করিয়া থাকি এবং তাহার বিরোধিতা করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাতে কাহার কি ক্ষতি হইল? বরং নিজেরই ক্ষতি হইল।

অপরদিকে যাহারা নামায পড়ে, তাহাদের মধ্যেও অনেকেই এমনভাবে নামায পড়ে যে, ইহাকে যদি নামাযের সাথে তামাশা করা বলা হয়, তবে অত্যুক্তি হইবে না। কেননা, নামাযের খুশু–খুজু তো দূরের কথা অনেকেই নামাযের অবশ্য করণীয় রুকনও পুরাপুরিভাবে আদায় করে না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নমুনা আমাদের সামনে রহিয়াছে—তিনি নিজে প্রতিটি কাজ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর আমলও আমাদের সামনে রহিয়াছে—

তাঁহাদের অনুসরণ করা উচিত।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর কিছু ঘটনা নমুনাস্বরূপ আমার রচিত 'হেকায়াতে সাহাবাহ' কিতাবে লিখিয়াছি, এখানে আর লেখার প্রয়োজন নাই। তবে এই কিতাবে সূফিয়ায়ে কেরামের কিছু ঘটনা নকল করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস নকল করিতেছি।

শায়েখ আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ) বিখ্যাত সূফীগণের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আমার ঘুমের এত চাপ হইল যে, রাত্রের নিয়মিত ওজীফাগুলিও ছুটিয়া গেল। তখন আমি স্বপ্নে দেখিলাম, অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী সবুজ রেশমী পোশাক পরিহিতা। যাহার পায়ের জুতাগুলি পর্যন্ত তসবীহ পাঠে মশগুল রহিয়াছে। সে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে, আমাকে পাওয়ার জন্য তুমি চেষ্টা কর, আমি তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করিতেছি। এই কথা বলিয়া সে কতকগুলি প্রেমের কবিতা পাঠ করিল। এই স্বপ্ন দেখিয়া আমি জাগিয়া গেলাম এবং কসম করিলাম যে, আমি রাত্রে আর কখনও ঘুমাইব না। বর্ণিত আছে, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি এশার ওযূ দ্বারা ফজরের নামায পড়িয়াছেন। (নুযহাহ)

শায়েখ মাজহার সা'দী (রহঃ) একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার ইশ্ক ও মহব্বতে দীর্ঘ ষাট বছর কান্নাকাটি করিয়াছেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, খাঁটি মেশ্কে পরিপূর্ণ একটি নহর। উহার কিনারায় মুক্তার গাছগুলিতে স্বর্ণের শাখাসমূহ বাতাসে দুলিতেছে। সেখানে অল্প বয়সের কয়েকটি কিশোরী উচ্চস্বরে তাসবীহ পাঠে মগ্ন রহিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? উত্তরে তাহারা কবিতার দুইটি চরণ পাঠ করিল, যাহার অর্থ হইল—আমাদিগকে মানুষের মাবূদ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরওয়ারদিগার ঐসব লোকের জন্য পয়দা করিয়াছেন, যাহারা রাত্রে আপন প্রতিপালকের সামনে নামাযে দুই পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকেন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া ও মোনাজাতে মশগুল থাকেন।

হযরত আবূ বকর যারীর (রহঃ) বলেন, আমার নিকট একজন নওজোয়ান গোলাম থাকিত। সারাদিন সে রোযা রাখিত এবং সারা রাত্র তাহাজ্জুদ নামায পড়িত। একদা আমার নিকট আসিয়া সে বলিল, ঘটনাক্রমে আজ রাত্রে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, মেহরাবের দেওয়াল ফাটিয়া গিয়াছে, উহা হইতে কয়েকটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন ছিল খুবই

কুৎসিত। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কাহারা আর এই কুৎসিত মেয়েলোকটিই বা কে? তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা হইলাম আপনার বিগত রাত্রিসমূহ আর এই মেয়েলোকটি হইল আপনার আজকের রাত্রি। (নুযহাহ)

জনৈক বুযুর্গ বলেন, এক রাত্রে আমার এত গভীর ঘুম আসিল যে, আমি ঘুম হইতে জাগিতে পারিলাম না। আমি স্বপ্নে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখিলাম। এমন সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। তাহার দেহ হইতে তীব্র সুগন্ধি ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এমন সুগন্ধি আমি জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। সে আমাকে একটি কাগজের টুকরা দিল, উহাতে কবিতার তিনটি চরণ লিখা ছিল ঃ তুমি নিদ্রার স্বাদে বিভোর হইয়া বেহেশতের বালাখানাসমূহকে ভুলিয়া গিয়াছ, যেখানে তোমাকে চিরকাল থাকিতে হইবে, সেখানে কখনও মৃত্যু আসিবে না। তুমি ঘুম হইতে উঠ, তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করা ঘুম হইতে অনেক উত্তম। তিনি বলেন, এই ঘটনার পর হইতে যখনই আমার ঘুম আসে এই কবিতাগুলি স্মরণ হইয়া যায় এবং আমার ঘুম একেবারে দূর হইয়া যায়।

হযরত আতা (রহঃ) বলেন, আমি এক বাজারে গেলাম, সেখানে একটি বাঁদী বিক্রয় হইতেছিল। বাঁদীটিকে পাগল বলা হইতেছিল। আমি সাত দীনার দিয়া তাহাকে খরিদ করিয়া আমার ঘরে লইয়া আসিলাম। যখন রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হইল, তখন দেখিলাম, সে উঠিয়া ওযূ করিল এবং নামায শুরু করিয়া দিল। নামাযের মধ্যে তাহার অবস্থা এমন হইতেছিল যে, কাঁদিতে কাঁদিতে যেন তাহার দম বাহির হইয়া যাইবে। নামাযের পর সে মোনাজাত শুরু করিল এবং বলিতে লাগিল, হে আমার মাবূদ, তুমি আমাকে যে মহব্বত কর—সেই মহব্বতের কসম, তুমি আমার উপর রহম কর। আমি তাহাকে বলিলাম, এইরূপ বলিও না ; বরং এরূপ বল যে, আমি তোমাকে যে মহব্বত করি—সেই মহব্বতের কসম। আমার এই কথা শুনিয়া সে রাগান্বিত হইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাকে মহব্বত না করিতেন, তবে তোমাকে মধুর নিদ্রায় বিভোর করিয়া আমাকে এইভাবে নামাযে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন না। ইহা বলিয়া সে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল এবং কয়েকটি কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করিল। যাহার অর্থ হইল ঃ অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্তর পুড়িয়া যাইতেছে, ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। প্রেমের জ্বালায় যে অস্থির সে কিভাবে স্থির হইতে

পারে? আয় আল্লাহ, যদি আনন্দদায়ক কিছু থাকে, তবে তাহা দান করিয়া আমার প্রতি দয়া কর। অতঃপর সে উচ্চস্বরে এই দোয়া করিল, আয় আল্লাহ, তোমার সহিত আমার এই নিবিড় সম্পর্ক এতদিন গোপন ছিল ; কেহই তাহা জানিত না। এখন মানুষের মধ্যে তাহা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে উঠাইয়া লও। এই কথা বলিয়া সজোরে সে একটি চীৎকার দিল এবং মরিয়া গেল।

এই ধরণেরই একটি ঘটনা হযরত সির্‌রী (রহঃ)এর সঙ্গেও ঘটিয়াছিল। তিনি বলেন, আমি আমার খেদমতের জন্য একটি বাঁদী খরিদ করিয়াছিলাম। নিজের অবস্থা গোপন রাখিয়া সে কিছুদিন আমার খেদমত করিতে থাকিল। নামাযের জন্য তাহার একটি জায়গা নির্দিষ্ট ছিল ; যখনই সে কাজকর্ম হইতে অবসর হইয়া যাইত, তখন সে সেখানে যাইয়া নামাযে মশগুল হইয়া যাইত। এক রাত্রে আমি তাহাকে দেখিলাম—কিছুসময় সে নামায পড়ে আবার কিছু সময় মোনাজাতে মশগুল হইয়া থাকে। মোনাজাতে সে বলে যে, হে আল্লাহ, তোমার যে মহব্বত আমার সাথে রহিয়াছে, উহার ওসীলায় তুমি আমার অমুক অমুক কাজ করিয়া দাও। আমি তাহাকে উচ্চস্বরে বলিলাম, হে মহিলা, তুমি এইরূপ বল যে, তোমার সাথে আমার যে মহব্বত রহিয়াছে উহার ওসীলায়। এই কথা শুনিয়া সে বলিতে লাগিল, হে মনিব, আমার প্রতি যদি তাহার মহব্বত না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আপনাকে নামায হইতে দূরে রাখিয়া আমাকে নামাযের জন্য দাঁড় করাইয়া রাখিতেন না। সিররী (রহঃ) বলেন, যখন সকাল হইল তখন আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, তুমি আমার খেদমতের উপযুক্ত নও ; তুমি শুধুমাত্র আল্লাহরই এবাদতের উপযুক্ত। অতঃপর কিছু সামানপত্র দিয়া আমি তাহাকে আযাদ করিয়া দিলাম।

(নুযহাহ)

হযরত সির্‌রী সাক্‌তী (রহঃ) একজন স্ত্রীলোকের অবস্থান বর্ণনা করেন ঃ যখন সে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়াইত, তখন বলিত, হে আল্লাহ, ইবলীসও তোমার বান্দা ; তাহার লাগাম তোমারই হাতে, সে আমাকে দেখে কিন্তু আমি তাহাকে দেখিতে পাই না। তুমি তাহার সকল কাজের উপর ক্ষমতা রাখ, কিন্তু সে তোমার কোন কাজের উপর ক্ষমতা রাখে না। হে আল্লাহ, সে আমার কোন ক্ষতি করিতে চাহিলে তুমি তাহা দূর করিয়া দাও, সে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলে তুমি সেই চক্রান্তের প্রতিশোধ নাও। তাহার ক্ষতি হইতে আমি তোমার আশ্রয় চাহিতেছি এবং তোমারই সাহায্যে আমি তাহাকে বিতাড়িত করিতেছি। এই মোনাজাত

করিয়া সে কাঁদিতে থাকিত। এমনকি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। লোকেরা তাহাকে বলিল, দেখ ; আল্লাহকে ভয় কর, তোমার দ্বিতীয় চক্ষুটিও না আবার নষ্ট হইয়া যায়। সে বলিল, আমার এই চক্ষু যদি জান্নাতের উপযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইহা অপেক্ষা উত্তম চক্ষু দান করিবেন, আর যদি ইহা দোযখের উপযুক্ত হয়, তবে উহা নষ্ট হইয়া যাওয়াই ভাল।

শায়খ আবূ আবদিল্লাহ জালা (রহঃ) বলেন, একদিন আমার আম্মা আমার আব্বাজানকে মাছ আনিতে বলিলেন। আব্বাজান আমাকে লইয়া বাজারে রওনা হইলেন। আমরা বাজার হইতে মাছ খরিদ করিলাম। মাছটি ঘর পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আমরা একজন কুলি তালাশ করিতেছিলাম। একজন নওজওয়ান ছেলে সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল ; সে বলিতে লাগিল, চাচাজান, মনে হয় মাছটি বহন করার জন্য আপনি কুলি তালাশ করিতেছেন? আব্বা বলিলেন, হাঁ। ছেলেটি মাছের বোঝা মাথায় উঠাইয়া আমাদের সাথে চলিতে লাগিল। পথে সে আযানের আওয়াজ শুনিতে পাইল। সে বলিতে লাগিল, আল্লাহর ডাক আসিয়া গিয়াছে, আমাকে ওযূও করিতে হইবে। আমি নামাযের পর পৌঁছাইয়া দিতে পারিব। এখন আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন—ইচ্ছা হয় অপেক্ষা করুন কিংবা আপনাদের মাছ আপনারা লইয়া যান। এই কথা বলিয়া সে মাছ রাখিয়া মসজিদে চলিয়া গেল। আমার আব্বা ভাবিলেন—এই গরীব ছেলেটি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করিতেছে ; আমাদের তো আরও বেশী করা উচিত। ইহা ভাবিয়া মাছ রাখিয়া আমরাও মসজিদে চলিয়া গেলাম। নামাযের পর আমরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মাছ সেইভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে। ছেলেটি উহা মাথায় লইয়া আমাদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল। ঘরে পৌঁছিয়া আব্বাজান এই আশ্চর্য ঘটনা আমার আম্মাকে শুনাইলেন। আম্মা বলিলেন, ছেলেটিকে মাছ খাওয়ার জন্য রাখিয়া দাও। তাহাকে এই কথা জানাইলে সে বলিল, আমি তো রোযা রাখিয়াছি। আব্বাজান তাহাকে সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়া ইফতার করিতে অনুরোধ করিলেন। সে বলিল, আমি একবার চলিয়া গেলে দ্বিতীয়বার আসি না। হাঁ ইহা হইতে পারে যে, আমি নিকটেই কোন মসজিদে অবস্থান করিব, সন্ধ্যায় আপনার দাওয়াত খাইয়া চলিয়া যাইব। এই কথা বলিয়া নিকটেই এক মসজিদে সে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় মাগরিবের পর সে আসিল এবং খানা খাইল। আমরা তাহাকে একটি নির্জন জায়গা দেখাইয়া দিলাম, সে সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। আমাদের পাশেই একজন পঙ্গু মহিলা

থাকিত। আমরা দেখিলাম সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া হাঁটিয়া আসিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কিভাবে সুস্থ হইলে? সে বলিল, আমি এই মেহমানের ওসীলা দিয়া দোয়া করিয়াছি, হে আল্লাহ, আমাকে তাহার বরকতে সুস্থ করিয়া দিন। সাথে সাথে আমি সুস্থ হইয়া গিয়াছি। এই ঘটনা শুনিয়া আমরা তাহাকে দেখিবার জন্য সেই নির্জন স্থানটিতে গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখি দরজা বন্ধ এবং ছেলেটির কোন চিহ্নও নাই।

এক বুযুর্গের ঘটনা আছে যে, তাঁহার পায়ে একটি ফোঁড়া দেখা দিয়াছিল। ডাক্তারগণ পরামর্শ দিল—যদি পা কাটিয়া না ফেলা হয়, তবে তাহার জীবননাশের আশংকা রহিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তাঁহার মা বলিলেন, আপনারা এখন বিরত থাকুন ; যখন সে নামাযে দাঁড়াইবে তখন কাটিয়া নিবেন। সুতরাং এইরূপই করা হইল—তিনি মোটেও টের পাইলেন না।

আবূ আমের (রহঃ) বলেন, একদা আমি একটি খুব ক্ষীণ ও দুর্বল বাঁদীকে দেখিলাম—বাজারে খুব কম দামে বিক্রয় হইতেছে। তাহার পেট কোমরের সহিত লাগিয়া গিয়াছিল। মাথার চুলও এলোমেলো অবস্থায় ছিল। তাহাকে দেখিয়া আমার খুবই দয়া হইল, তাই আমি তাহাকে খরিদ করিয়া নিলাম। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, আমার সঙ্গে বাজারে চল, রমযানের জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনিতে হইবে। সে বলিতে লাগিল, আল্লাহ পাকের শোকর, যিনি বছরের সবগুলি মাস আমার জন্য একই রকম করিয়া দিয়াছেন। সে দিনভর রোযা রাখিত এবং রাতভর নামায পড়িত। যখন ঈদের দিন নিকটবর্তী হইল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম, আগামীকাল সকালে বাজারে যাইব তুমিও আমার সাথে যাইবে—ঈদের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিতে হইবে। সে বলিতে লাগিল, হে আমার মনিব! আপনি তো দুনিয়াদারীতে খুবই মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিয়া নামাযে মশগুল হইয়া গেল এবং অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ধীরস্থিরভাবে এক একটি আয়াত স্বাদ লইয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। এইভাবে যখন এই আয়াতে পৌছিল ঃ

وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ الاية অর্থাৎ জাহান্নামে পুঁজ মিশ্রিত পানি পান করানো হইবে। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ঃ ১৬)

তখন সে এই আয়াতকে বারবার পড়িতে লাগিল এবং একটি বিকট চিৎকার দিয়া এই দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গেল।

একজন সৈয়দ সাহেবের ঘটনা আছে যে, বার দিন পর্যন্ত তিনি একই ওযূ দ্বারা সমস্ত নামায পড়িয়াছিলেন এবং একাধারে পনের বৎসর পর্যন্ত

তাহার শুইবার সুযোগ হয় নাই। একাধারে কয়েক দিন দিন এমনভাবে কাটিয়া যাইত যে, কোন কিছু মুখে দেওয়ারও সুযোগ হইত না।

যাহারা মোজাহাদা করিয়াছেন এমন লোকদের জীবনে এইরূপ বহু ঘটনা পাওয়া যায়। তাহাদের মত হওয়ার বাসনা খুবই কঠিন ব্যাপার—কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পয়দাই করিয়াছেন এইরূপ কাজের জন্য। কিন্তু যে সকল বুযুর্গানে-দ্বীন, দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের মধ্যেই মশগুল থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তাহাদের মত হওয়ার বাসনাও আমাদের জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) সম্পর্কে সকলেই অবগত আছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরেই তাঁহার মর্তবা। তাঁহার বিবি বলেন, ওযূ-নামাযে মশগুল থাকে এমন বহু লোক পাওয়া যাইবে কিন্তু তাঁহার চাইতে বেশী আল্লাহকে ভয় করে এমন মানুষ আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। এশার নামাযের পর জায়নামাযে বসিয়া থাকিতেন এবং হাত উঠাইয়া দোয়া ও মোনাজাতে মশগুল হইতেন। আর কাঁদিতে কাঁদিতে এই অবস্থাতেই এক সময় তন্দ্রা আসিত আর চোখ লাগিয়া যাইত। আবার যখন চোখ খুলিয়া যাইত তখনই পুনরায় দোয়া ও কান্নায় মশগুল হইয়া যাইতেন।

বর্ণিত আছে যে, খেলাফত লাভের পর হইতে তাঁহার ফরজ গোসলের প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন বাদশাহ আবদুল মালেকের কন্যা। পিতা কন্যাকে অনেক অলংকার ও ধনরত্ন দিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া এইগুলির সঙ্গে একটি অতুলনীয় হীরকও দিয়াছিলেন। খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) একদিন তাঁহার বিবিকে বলিলেন, দুইটি বিষয়ের মধ্যে যেকোন একটি তুমি গ্রহণ কর—তোমার এই সমুদয় অলংকার ও ধনরত্ন তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়া দাও ; আমি উহা বায়তুল-মালে জমা করিয়া দিব। অন্যথায় তুমি আমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ কর। কারণ, ধনরত্ন ও আমি এক ঘরে থাকিতে পারি না। বিবি আরজ করিলেন, এইসব ধনরত্ন একেবারেই নগণ্য ; ইহা হইতে আরও অনেক বেশী হইলেও আমি এইসবের বিনিময়ে আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। এই কথা বলিয়া তিনি সমস্ত ধনসম্পদ বায়তুল-মালে জমা করিয়া দিলেন।

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর আবদুল মালেকের পুত্র ইয়াযীদ বাদশাহ হইলেন। তিনি বোনকে বলিলেন, তুমি চাহিলে তোমার সমস্ত অলংকার ফেরত দেওয়া হইবে। কিন্তু তিনি উত্তরে

বলিলেন, আমার স্বামীর জীবনকালে এইসব অলংকার রাখিতে আমি রাজী হই নাই এখন তাঁহার মৃত্যুর পর এইগুলি দ্বারা আমি কি করিয়া সন্তুষ্ট হইব।

মৃত্যুশয্যায় হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) লোকদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই রোগ সম্পর্কে কি ধারণা হয়? কেহ বলিল, লোকেরা ইহাকে যাদু মনে করিতেছে। তিনি বলিলেন, যাদু নয়। অতঃপর তিনি এক গোলামকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের লোভে তুমি আমাকে বিষপান করাইয়াছ? সে বলিল, আমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হইয়াছে এবং আমার মুক্তির ওয়াদা করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, স্বর্ণমুদ্রাগুলি নিয়া আস। স্বর্ণমুদ্রাগুলি নিয়া আসিলে তিনি সেইগুলি বায়তুল-মালে জমা করিয়া দিলেন। অতঃপর গোলামকে বলিলেন, তুমি এমন কোথাও নিরুদ্দেশ হইয়া যাও যেখানে তোমাকে কেহ দেখিতে না পায়।

মৃত্যুর সময় হযরত মাস্‌লামাহ (রহঃ) তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আপনি সন্তানদের ব্যাপারে যে আচরণ করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আর কেহ করে নাই—আপনার তেরজন পুত্র সন্তান রহিয়াছে, তাহাদের জন্য কোন টাকা-পয়সা রাখিয়া গেলেন না। তিনি বলিলেন, আমাকে একটু বসাও। বসিয়া বলিলেন, আমি তাহাদের কোন হক নষ্ট করি নাই এবং অন্যের হকও আমি তাহাদিগকে দেই নাই। তাহারা যদি নেককার হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালাই তাহাদের জিম্মাদার, যেমন আল্লাহ পাক কুরআনে বলিয়াছেন ঃ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ "একমাত্র আল্লাহই নেককার লোকদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

(সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ১৯৬)

আর যদি তাহারা গোনাহগার হয়, তবে তাহাদের ব্যাপারে আমার কোন পরওয়া নাই।

ফেকাহ-শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) সারাদিন মাসলা-মাসায়েলের চর্চায় মগ্ন থাকিতেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি রাত্র-দিনে তিনশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহঃ) এক রাকাতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করিতেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) হাদীসের হাফেজ ছিলেন। এক রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযে তিনি অতিমাত্রায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, নামাযে তেলাওয়াতের সময় এই আয়াত শরীফ আসিয়া গিয়াছিল ঃ

وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ (সূরা যুমার, আয়াত ঃ ৪৭)

পূর্বের আয়াতে বলা হইয়াছে যে, জুলুমকারীদের কাছে যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ থাকে, এমনকি সেই পরিমাণ আরও সম্পদও থাকে, তবে কিয়ামতের দিনের কঠিন আজাব হইতে বাঁচিবার জন্য তাহারা সমস্ত সম্পদ ফিদিয়া স্বরূপ দিয়া দিতে চাহিবে। অতঃপর উক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে, আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের সম্মুখে এমন ব্যাপার (অর্থাৎ আজাব) উপস্থিত হইবে, যাহা তাহাদের কল্পনাতেও ছিল না এবং তখন তাহাদের মন্দকাজসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) মৃত্যুর সময়ও খুব ঘাবড়াইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, এই আয়াতকেই আমি ভয় করিতেছি।

হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) হাদীসের হাফেজ ছিলেন। তিনি আল্লাহর সামনে এত অত্যধিক ক্রন্দন করিতেন যে, উহার কোন সীমা ছিল না। কেহ আরজ করিল, আপনার চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি উত্তর করিলেন, চোখের দ্বারা যদি ক্রন্দনই না করিলাম তবে ইহার উপকারিতাই বা কি? তিনি দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! কবরে যদি তুমি কাহাকেও নামায পড়িবার অনুমতি দাও, তবে তাহা আমাকেও দিও। আবু সিনান (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, ছাবেত বুনানী (রহঃ)কে যাহারা দাফন করিয়াছে তন্মধ্যে আমি একজন ছিলাম। দাফনের সময় কবরের একটি ইট পড়িয়া গেল। দেখিতে পাইলাম তিনি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছেন। আমি সঙ্গীকে বলিলাম, দেখ কি হইতেছে! সে আমাকে চুপ করিতে বলিল। দাফনের পর আমরা ছাবেত বুনানী (রহঃ)এর বাড়ীতে গিয়া তাহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ছাবেত (রহঃ) কি আমল করিতেন? কন্যা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এই প্রশ্ন কেন করিতেছ? আমরা কবরের সেই ঘটনা শুনাইলাম। অতঃপর কন্যা বলিল, পঞ্চাশ বৎসর তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন এবং সকালবেলায় এই দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! কাহাকেও যদি তুমি কবরে নামায পড়িবার অনুমতি দাও, তবে আমাকেও দান করিও। (একামাতুল হুজ্জাহ্)

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)এর জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ততার কথা সকলেরই জানা আছে। ইহা ছাড়া সমগ্র ইসলামী খেলাফতের প্রধান বিচারপতি হিসাবেও তাঁহার ব্যস্ততা ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি দৈনিক দুইশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। হযরত মুহম্মদ ইবনে নসর (রহঃ) একজন বিখ্যাত মুহাদ্দেস ছিলেন। তিনি এত বেশী একাগ্রতার সহিত নামায পড়িতেন যে, উহার দৃষ্টান্ত পাওয়া খুবই কঠিন। একবার নামাযের

ভিতর একটি ভীমরুল তাঁহার কপালে দংশন করার দরুন ক্ষতস্থান হইতে রক্তও বাহির হইল কিন্তু তিনি মোটেও নড়াচড়া করিলেন না এবং নামাযের মনোযোগের মধ্যেও সামান্যতম পার্থক্য দেখা দিল না। বর্ণিত আছে যে, নামাযের সময় তিনি কাঠের মত অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

হযরত বাকী ইবনে মুখাল্লাদ (রহঃ) দৈনিক তাহাজ্জুদ ও বেতরের তের রাকাত নামাযে কুরআন শরীফ খতম করিতেন। হযরত হান্নাদ (রহঃ) মুহাদ্দেস ছিলেন। তাঁহার জনৈক শাগরেদ বর্ণনা করেন যে, তিনি খুব বেশী ক্রন্দন করিতেন। একদিন সকালবেলা তিনি আমাদিগকে ছবক পড়াইতে ছিলেন। ছবক হইতে উঠিয়া ওযূ ইত্যাদি হইতে ফারেগ হইয়া দুপুর পর্যন্ত নফল নামাযে মগ্ন থাকিলেন। অতঃপর বাড়ীতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া যোহরের নামায পড়াইলেন অতঃপর আছরের নামায পর্যন্ত নফল নামাযে মগ্ন থাকিলেন। তারপর আছরের নামায পড়াইলেন এবং মাগরিব পর্যন্ত কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে মগ্ন থাকিলেন। মাগরিবের পর আমি চলিয়া আসিলাম। তাঁহার এক প্রতিবেশীকে আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, ইনি কত বেশী এবাদত করিয়া থাকেন। প্রতিবেশী বলিল, সত্তর বৎসর যাবত তিনি এইভাবেই এবাদত করিয়া আসিতেছেন, যদি তুমি তাহার রাত্রের এবাদত দেখিতে তাহা হইলে আরও আশ্চর্যবোধ করিতে।

হযরত মাসরূক (রহঃ) একজন মুহাদ্দেস ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বর্ণনা করেন, তিনি নামাযে এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতেন যে, সবসময় তাহার পা ফুলিয়া থাকিত। আমি পিছনে বসিয়া তাহার অবস্থার উপর দয়াপরবশ হইয়া কাঁদিতাম।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত এশা ও ফজরের নামায একই ওযূতে পড়িয়াছেন। হযরত আবুল মু'তামির (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি এইরূপ করিয়াছেন। ইমাম গাযযালী (রহঃ) আবু তালেব মক্কী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, চল্লিশজন তাবেঈ সম্পর্কে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা এশা ও ফজর একই ওযূতে পড়িতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এই আমল করিয়াছেন। (ইত্বাক)

হযরত ইমাম আজম আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা আছে যে, ত্রিশ বৎসর কিংবা চল্লিশ বৎসর কিংবা পঞ্চাশ বৎসর এশা ও ফজর একই ওযূতে পড়িয়াছেন। বর্ণনার এই পার্থক্য বর্ণনাকারীদের জানার পার্থক্যের কারণে হইয়াছে। যিনি যত বৎসরের কথা জানিতে

পারিয়াছেন, তিনি তত বৎসর বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি শুধুমাত্র দুপুরে সামান্য সময় ঘুমাইতেন এবং বলিতেন, হাদীস শরীফে দুপুরে ঘুমানোর হুকুম রহিয়াছে।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রমযান মাসে নামাযে কুরআন শরীফ ষাট খতম করিতেন। এক বুযুর্গ বলেন, আমি কয়েকদিন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর ঘরে ছিলাম—তাঁহাকে দেখিয়াছি শুধু রাত্রে সামান্য সময় ঘুমাইতেন।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) দৈনিক তিনশত রাকাত পড়িতেন। তৎকালীন বাদশাহর হুকুমে বেত্রাঘাতের পর দুর্বলতা খুবই বাড়িয়া যাওয়ায় শেষ বয়সে দেড়শত রাকাত পড়িতেন। তখন বয়স প্রায় আশি বৎসর ছিল। আবু আত্তার সুলামী (রহঃ) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সারারাত্র ক্রন্দন করিয়া কাটাইতেন এবং দিনে সর্বদা রোযা রাখিতেন।

আল্লাহ পাকের তওফীকপ্রাপ্ত বান্দাদের সম্পর্কে এইরূপ হাজারো লাখো ঘটনা ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাবে রহিয়াছে, লেখার গণ্ডিতে সেইগুলিকে আনা খুবই কঠিন। নমুনাস্বরূপ এই কয়েকটি ঘটনাই যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও মেহেরবাণীতে আমাকে এবং পাঠকগণকেও এই সমস্ত আল্লাহ ওয়ালাদের কিছুমাত্র অনুসরণ করার তওফীক দান করুন—আমীন।

(١) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهٗ إِلَّا عُشْرُ صَلٰوتِهٖ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا

نبیِ اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اُس کیلئے ثواب کا دسواں حصّہ لکھا جاتا ہے اسی طرح بعض کیلئے نواں حصّہ بعض کیلئے آٹھواں ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصّہ لکھا جاتا ہے۔

(رواه ابوداؤد وقال المنذری فی الترغیب رواه ابوداؤد والنسائی وابن حبان فی صحیحه بنحوه اه وعزاه فی الجامع الصغیر الی احمد وابی داؤد وابن حبان ورقم له بالصحیح وفی المنتخب عزاه الی احمد ایضًا وفی الدر المنثور اخرج احمد عن ابی الیسر مرفوعًا منکم من یصلی الصلوة کاملة ومنکم من یصلی النصف والثلث والربع حتی بلغ العشر قال المنذری فی الترغیب رواه النسائی باسناد حسن واسم ابی الیسر کعب بن عمرو السلمی شهد بدرًا اه)

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মানুষ নামায পড়িয়া শেষ করে আর তাহার জন্য সওয়াবের দশ ভাগের একভাগ লেখা হয়, এমনিভাবে কাহারও জন্য নয় ভাগের এক ভাগ, কাহারও জন্য আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ আর কাহারও জন্য অর্ধেক সওয়াব লেখা হয়। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ নামাযের মধ্যে যে পরিমাণ মনোযোগ ও এখলাস হয়, সেই পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি কেহ পুরা সওয়াবের দশ ভাগের এক ভাগ পায় যদি সেই অনুযায়ী মনোযোগী হয়। আবার কেহ অর্ধেক সওয়াব পায়। এমনিভাবে কেহ দশ ভাগের এক ভাগ হইতেও কম কিংবা অর্ধেক হইতেও বেশী পায়। এমনকি কেহ আবার পুরা সওয়াব পাইয়া যায়। আবার কেহ মোটেই পায় না। কেননা তাহার নামায সেই উপযুক্ত হয় নাই। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, ফরজ নামাযের জন্য আল্লাহর নিকট একটি পরিমাপ আছে, উহাতে যে পরিমাণ কমি হয়, তাহার হিসাব করা হয়। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, মানুষের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম খুশু অর্থাৎ নামাযের একাগ্রতা উঠাইয়া নেওয়া হইবে। পুরা জামাতের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও খুশুর সহিত নামায আদায়কারী পাওয়া যাইবে না। (জামে সগীর)

(٢) رُوِيَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا وَاَسْبَغَ لَهَا وُضُوْئَهَا وَاَتَمَّ لَهَا قِيَامَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُسْفِرَةٌ تَقُوْلُ حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَنِيْ وَمَنْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا وَلَمْ يُسْبِغْ لَهَا وُضُوْئَهَا وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا خُشُوْعَهَا وَلَا رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُوْلُ ضَيَّعَكَ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے وضو بھی اچھی طرح کرے خشوع وخضوع سے بھی پڑھے کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہٗ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی

اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِيْ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ لُفَّتْ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلِقُ ثُمَّ ضُرِبَ بِهَا وَجْهُهُ.

ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوتی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماردیجاتی ہے۔

(رواه الطبرانی فی الاوسط كذا فی الترغيب والدر المنثور وعزاه فی المنتخب الی البیهقی فی الشعب وفيه ايضًا برواية عبادةؓ بمعناه وزاد فی الاولی بعد قوله كما حفظتنی ثم اصعد بها الی السماء ولها ضوء ونور ففتحت له ابواب السماء حتّٰى ينتهی بها الی الله فتشفع لصاحبها وقال فی الثانية وغلقت دونها ابواب السماء وعزاه فی الدر الی البزار والطبرانی وفی الجامع الصغير حديث عبادة الی الطيالسی وقال صحيح)

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সময়মত নামায আদায় করে, উত্তমরূপে ওযূ করে, খুশু-খুযুর সহিত পড়ে, ধীর-স্থিরভাবে নামাযে দাঁড়ায়, রুকু-সেজদাও উত্তমরূপে শান্তভাবে করে, মোটকথা নামাযের সবকিছু উত্তমরূপে আদায় করে, তাহার নামায উজ্জ্বল ও নূরানী হইয়া উপরে যায় এবং নামাযীকে দোয়া দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার এরূপ হেফাজত করুন, যেইরূপ তুমি আমার হেফাজত করিয়াছ। অপরদিকে, যে ব্যক্তি মন্দভাবে নামায আদায় করে, সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখে না, ওযূও ভালরূপে করে না, রুকু-সেজদাও ঠিকমত করে না, তাহার নামায বিশ্রী ও কালো হইয়া বদ-দোয়া দিতে দিতে যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও এরূপ ধ্বংস করুন, যেরূপ তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়াছ। অতঃপর সেই নামাযকে পুরানো কাপড়ের মত পেঁচাইয়া নামাযীর মুখের উপর মারিয়া দেওয়া হয়।

(তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ ভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক, যাহারা উত্তমরূপে নামায আদায় করে—যদ্দরুণ আল্লাহ তায়ালার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত তাহার জন্য দোয়া করে। কিন্তু সাধারণতঃ যেভাবে নামায পড়া হয় যেমন রুকু হইতে সোজা সেজদায় চলিয়া গেল, প্রথম সেজদা হইতে সোজা হইয়া না বসিয়া মাথা তুলিয়াই কাকের মত আরেক ঠোকর মারিয়া দিল। এইরূপ নামাযের যে কি পরিণতি, তাহা তো হাদীস শরীফে বলাই হইয়াছে। তদপুরি ঐ

নামায যখন বদ-দোয়া করে তখন নিজের ধ্বংসের অভিযোগ করিয়া লাভ কি? এই কারণেই আজ মুসলমান অধঃপতনের দিকে যাইতেছে, চারিদিকে শুধু ধ্বংসের আওয়াজই প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

অন্য এক হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাতে অতিরিক্ত ইহাও রহিয়াছে যে, যে নামায খুশু-খুজুর সহিত পড়া হয়, উহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া যায়। উহা অত্যন্ত নূরানী হয় এবং নামাযীর জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে সুপারিশ করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে নামাযে কোমর ঝুকাইয়া উত্তমরূপে রুকু আদায় করা হয় না, উহার উদাহরণ হইল ঐ গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মত যাহার প্রসবের সময় নিকটবর্তী হইলে গর্ভপাত হইয়া যায়। (তারগীব) এক হাদীস শরীফে এরশাদ হইয়াছে, অনেক রোযাদার ব্যক্তি এমন রহিয়াছে, যাহাদের রোযা দ্বারা শুধু ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ছাড়া আর কিছুই হাসিল হয় না। এমনিভাবে অনেক রাত্রি জাগরণকারী শুধু জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই পায় না।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পাঁচ ওয়াক্তের নামাযসমূহ এরূপ লইয়া আসিবে, যাহাতে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, উত্তমরূপে ওযূ করা হইয়াছে এবং খুশু-খুজুর সহিত পড়া হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাকে আজাব দেওয়া হইবে না। আর যে ব্যক্তি এইরূপ নামায লইয়া আসিবে না, তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালার কোন ওয়াদা নাই—ইচ্ছা করিলে তিনি নিজ রহমত গুণে মাফ করিয়া দিবেন অথবা আজাব দিবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিকট তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি জান আল্লাহ পাক কি বলিয়াছেন? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) উত্তর করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। অধিক গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি একই প্রশ্ন তিনবার করিলেন এবং সাহাবীগণ একই উত্তর দিলেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আল্লাহ তায়ালা আপন ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম করিয়া বলিতেছেন, যে ব্যক্তি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল নামায পড়িতে থাকিবে, আমি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি ইহা করিবে না ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করিব, না হয় আজাব দিব।

(٣) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلٰوتُهٗ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ وَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِیْضَةٍ قَالَ الرَّبُّ اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِیْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَیُکَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِیْضَةِ ثُمَّ یَکُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهٖ عَلٰی ذٰلِكَ۔

نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائیگا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد، خسارہ میں ہوگا اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشادِ خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندہ کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کردیا جائے۔ اگر نکل آئیں تو اُن سے فرضوں کی تکمیل کردیجائیگی اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال روزہ زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔

(رواه الترمذی وحسنه النسائی وابن ماجة والحاکم وصححه کذا فی الدر وفی المنتخب بروایة الحاکم فی الکنی عن ابن عمر اوّل ما افترض اللّٰه علی امّتی الصلوات الخمس واوّل ما یرفع من اعمالهم الصلوات الخمس الحدیث بطوله بمعنی حدیث الباب وفیه ذکر الصیام والزکوٰة نحو الصلوٰة وفی الدر اخرج ابویعلی عن انس رفعه اوّل ما افترض اللّٰه علی الناس من دینهم الصّلوٰة واٰخر ما یبقی الصلوٰة واوّل ما یحاسب به الصّلوٰة یقول اللّٰه انظروا فی صلوٰة عبدی فان کانت تامة کتبت تامة وان کانت ناقصة قال انظروا هل له من تطوع الحدیث فیه ذکر الزکوٰة والصدقة وفیه ایضا اخرج ابن ماجة والحاکم عن تمیم الداری مرفوعًا اوّل ما یحاسب به العبد یوم القیامة صلوٰته الحدیث وفی اٰخره ثم الزکوٰة مثل ذٰلك ثم توخذ الاعمال حسب ذٰلك وعزاه السیوطی فی الجامع الی احمد وابی داؤد والحاکم وابن ماجة ورقم له بالصحیح)

(৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ফরজ নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি তাহার নামায ঠিক হয়, তবে সে কামিয়াব ও

সফলকাম হইবে। আর যদি তাহার নামায ঠিক না হয়, তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যদি তাহার ফরজ নামাযে কিছু ঘাটতি দেখা যায়, তবে আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, দেখ, এই বান্দার কিছু নফল আছে কিনা, যাহা দ্বারা তাহার ফরজের ঘাটতি পূরণ করা যাইতে পারে। যদি পাওয়া যায়, তবে উহা দ্বারা তাহার ফরজ পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর বান্দার রোযা, যাকাত ইত্যাদি অন্যান্য আমলের হিসাব লওয়া হইবে।

(দুররে মানসূর ঃ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীস শরীফের দ্বারা জানা গেল যে, প্রত্যেকের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ নফলের পুঁজিও রাখা উচিত। যাহাতে ফরজের মধ্যে কোন ঘাটতি হইলে নফলের দ্বারা সেই ঘাটতি পূরণ করিয়া লওয়া যায়। অনেকেই বলিয়া থাকে, আরে ভাই আমাদের দ্বারা শুধু ফরজ পুরা হইয়া গেলেই যথেষ্ট ; নফল পড়া তো বুযুর্গদের কাজ। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ফরজই যদি পুরাপুরি আদায় হইয়া যায় তবে তো যথেষ্ট হইবে কিন্তু উহা পুরাপুরি আদায় হওয়া কি সহজ কাজ। যখন কম-বেশী ভুল-ত্রুটি হইয়াই থাকে তখন উহা পুরা করিবার জন্য নফল ছাড়া উপায় নাই।

অন্য এক হাদীসে আরও বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা এবাদতের মধ্যে সর্বপ্রথম নামায ফরজ করিয়াছেন, সর্বপ্রথম সমস্ত আমলের মধ্যে নামাযকেই পেশ করা হয় এবং কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই নামাযেরই হিসাব লওয়া হইবে। যদি ফরজ নামাযে কিছুটা কমি দেখা যায়, তবে নফল দ্বারা উহা পূরণ করা হইবে। অতঃপর একইভাবে রোযার হিসাব লওয়া হইবে—ফরজ রোযার মধ্যে যেসব কমি পাওয়া যাইবে নফল রোযার দ্বারা উহা পূরণ করা হইবে। অতঃপর যাকাতের হিসাবও একইভাবে লওয়া হইবে। এই সমস্ত আমলের সহিত নফল যোগ করিবার পর যদি নেকীর পাল্লা ভারী হয়, তবে সে আনন্দচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অন্যথায় তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদত ছিল যে, কেহ নতুন মুসলমান হইলে সর্বপ্রথম তাহাকে নামায শিক্ষা দিতেন।

(৪) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الصَّلٰوةُ فَاِنْ صَلُحَتْ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اُتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو

صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهٖ وَاِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهٖ۔

باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔

حضرت عمرؓ نے اپنے زمانۂ خلافت میں ایک اعلان سب جگہ کے حُکّام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ مُہتم بالشان چیز میرے نزدیک نماز ہے جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کرسکتا ہے اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کردے گا۔

(رواه الطبراني في الاوسط ولا بأس باسناده انشاء الله كذا في الترغيب وفي المنتخب برواية الطبراني في الاوسط ايضًا عن انس بلفظه وفي الترغيب عن ابي هريرة رفعه الصلوة ثلثة اثلاث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن اداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلوته رد عليه سائر عمله رواه البزار وقال لا نعلمه مرفوعًا الا من حديث المغيرة بن مسلم قال الحافظ واسناده حسن اه واخرج مالك في الموطا ان عمر بن الخطاب كتب الى عماله ان اهم اموركم عندي الصلوة من حفظها او حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع كذا في الدر)

(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি উহা উত্তম ও পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তবে অন্যান্য আমলও সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি উহা খারাপ হয়, তবে অন্যান্য আমলও খারাপ বলিয়া গণ্য হইবে। (তারগীব ঃ তাবারানী)

হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার খেলাফতের যুগে সব এলাকার শাসনকর্তাদের নামে একটি ফরমান পাঠাইয়াছিলেন যে, আমার নিকট সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল নামায। যে ব্যক্তি উহার হেফাজত এবং এহতেমাম করিবে, সে দ্বীনের অন্যান্য কাজেরও এহতেমাম করিতে পারিবে। আর যে ব্যক্তি নামাযকে ধ্বংস করিবে সে দ্বীনের অন্যান্য কাজকে আরও বেশী ধ্বংস করিবে। (দুররে মানসূর ঃ মুআত্তা মালেক)

ফায়দা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র বাণী এবং হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ঘোষণার উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ ইহাই, যাহা অন্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, শয়তান মুসলমানকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভয় করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পাবন্দীর সহিত উত্তমরূপে নামায আদায় করিতে